উৎস।

রায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর

প্রণীত।

প্রকাশক—

শ্রীদাশরথি পতি বিদ্যাবিনোদ;

কেশিয়াড়ি—মেদিনীপুর।

সন ১৩২৩ সাল।

[মূল্য—।০ আনা।

কলিকাতা

৪৭ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটস্থ কুন্তুমিকা প্রেস হইতে

শ্রীআশুতোষ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ-পত্র।

এই পুস্তকখানি---

পরম ভাগবত আমার পরমারাধ্য স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠভ্রাত

রঘুনাথ দাস প্রহরাজ মহোদয়ের

উদ্দেশ্যে ভক্তি-সহকারে উৎসর্গ করিলাম। ইতি--

রায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর।

প্রস্তুতি।

শ্রীযুক্ত রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর মহোদয়ের একান্ত ইচ্ছা যে, তাঁহার এই পুস্তক সম্বন্ধে আমি কিছু বলি। কেন যে তিনি আমার উপর এই আদেশ প্রচার করিলেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। যাঁহারা আমাকে জানেন, আমার বিদ্যাবুদ্ধির সংবাদ রাখেন, তাঁহারা একবাক্যে বলিবেন, এই পুস্তকের সম্বন্ধে সামান্য একটা কথা বলিবার যোগ্যতাও আমার নাই। পূজনীয় শ্রীযুক্ত প্রহরাজ মহোদয় একথা স্বীকার করিতে চান না; তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতেই হইবে।

গ্রন্থকার মহোদয় সভাসমিতিতে যে সকল অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন এবং সাময়িক পত্রাদিতে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহারই অল্প কয়েকটা সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিবেন, তাঁহারাই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, এই উপদেশাবলিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় না রাখিয়া গ্রন্থ-নিবদ্ধ করা ভালই হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রহরাজ মহোদয়ের চিন্তাশীলতা, মহানুভবতা এবং ধর্ম্মপ্রাণতা এই গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পরিস্ফুট। তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ; তিনি ব্রাহ্মণোচিত

গুণগ্রামের অধিকারী; তিনি গভীর শাস্ত্রজ্ঞ; তাঁহার লেখনী হইতে শাস্ত্রের কথাই নিঃসৃত হইয়াছে। এবং প্রত্যেক প্রবন্ধ তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, অবিচলিত ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাঁহার ভাষা মার্জ্জিত; সে ভাষার তেজ আছে; সে ভাষার মধ্যদিয়া গ্রন্থকারের প্রকৃতমূর্ত্তি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

এই গ্রন্থে সংগৃহীত প্রবন্ধাবলী সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোচনা করা আমার সাধ্যাতীত; আমি সে চেষ্টাও করিব না। পাঠকগণ গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন, একথা আমি বলিতে পারি,—বিশেষ দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি।

কলিকাতা,
১০ই আষাঢ়, ১৩২৩। } শ্রীজলধর সেন।

সূচীপত্র।

অভিষেকোৎসব।

সমাগত সভ্য মহোদয়গণ! প্রিয় ছাত্রবৃন্দ!

আজ আপনারা আমাকে যে আসন প্রদান করিয়াছেন, ইহা একপক্ষে আমার গৌরবোদ্যোতক হইলেও, পক্ষান্তরে আমার সৌভাগ্যের পরিচায়ক।

আজ ইতিহাসের একটী চিরস্মরণীয় দিন; অতি আনন্দের দিন; অনন্তকালের অনন্ত অঙ্গে দিনটী এক বহুমূল্য রত্নালঙ্কার-ভূষিত অঙ্গ-বিশেষ; আজ আমরা সনাথ হইব; স্বর্গত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের পবিত্র সিংহাসন আজ তাঁহার বংশাবতংস মহামান্য সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হইবে। বিপুল সাম্রাজ্য-উপহার লইয়া রাজলক্ষ্মী আজ আমাদের নবীন সম্রাট্‌কে বরণ করিবেন। ইহা অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি হইতে পারে? সময় সমাগত হইলে অমৃতাংশু অম্বর হইতে অপসৃত হন, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিদেবী অরুণাভা-রঞ্জিত অংশুমালীকে আনিয়া লোক-লোচনের গোচরীভূত করে; অমনই উষাও পদ্মহস্ত প্রসারিত করিয়া উদীয়মান অংশুমালীকে অরুণাভার সহিত বরণ করিয়া কৃতার্থ হয়। আজ নিয়তি, মহিমবর সপ্তম এডওয়ার্ডের তিরোধানে তদীয় সুযোগ্য পুত্র মহামান্য সম্রাট্ পঞ্চম জর্জকে তাঁহার পবিত্র সিংহাসনে সমাসীন করিতেছে; ভারতভূমি! তুমিও আজ উষার ন্যায় ভক্তি সহকারে মহারাজ্ঞী মেরীর সহিত নবীন

সম্রাট্‌কে বরণ করিয়া লও! ভারতবাসী ধন্য হউক; সনাথ হউক; আনন্দ ও শান্তির স্রোতে ভারত প্লাবিত হউক!

ভারতবাসী চিররাজভক্ত; অধিকন্তু হিন্দুর প্রত্যেক কার্য্যে রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা চিরাচরিত; হিন্দু সঙ্কল্পের প্রথমেই—

'—রাজ্ঞঃ প্রজানাং শান্তির্ভবতু'—

এই শান্তি-বচন পাঠ করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যের ভিত্তিস্থাপন করেন, এবং কার্য্যান্তে—

'—কালে বর্ষতু পর্জ্জন্যঃ পৃথিবী শস্যশালিনী দেশোঽয়ং ক্ষোভরহিতো ব্রাহ্মণাঃ সন্তু নির্ভয়াঃ'—

এই বলিয়া সুবৃষ্টি, সুভিক্ষ ও দেশের কল্যাণ কামনা করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যের উপসংহার করেন; সুতরাং হিন্দুর পক্ষে যে আজ বিশেষ আনন্দের দিন তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। সমবেত সভ্যমণ্ডলী! সমবেত ছাত্র ও পাঠক-বৃন্দ! সকলে সমস্বরে বলুন,—

"জয় মহারাণী মেরীর জয়,
জয় সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের জয়।"

যে দিক্ দিয়াই দেখুন, রাজাকে, আমরা দেবতা নির্ব্বিশেষে ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিতে বাধ্য। যাঁহারা স্বীয় আর্য্যত্ব বিস্মৃত হইয়া দেশান্তরীণ বিসদৃশ আদর্শে অনুপ্রাণিত, পৃথিবীর ভারভূত সেই উদ্ভট জীবগুলির কথা স্বতন্ত্র; নতুবা যাঁহাদের প্রত্যেক ধমনী এখনও সেই আর্য্য-শোণিতের পবিত্র

সংস্পর্শে পবিত্র, তাঁহারা ভ্রমেও রাজার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেন না বা করিতে পারেন না।

যোগিগণ যোগভ্রষ্ট হইলে শুচি বা শ্রীমান্‌দিগের ঘরেই জন্মগ্রহণ করেন ;

'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে,'

নিখিল জ্ঞান ও সত্যের আকর গীতার এই বচন।

আবার যোগীদের মধ্যে কে কোন্ সময় জীবন-লীলার সংবরণ করিলে কি গতি প্রাপ্ত হন, তাহারও নির্দ্দেশ আছে। যোগের আকর "ওঁ'কার" উপাসনাই প্রধান,—অ, উ, ম, এই তিন অক্ষরের সংযোগে ওঁ এইবর্ণ উচ্চারিত হয় ; ইহাতে অর্দ্ধেক মাত্রা অর্থাৎ যাহা নাদবিন্দু-স্বরূপ তাহাও আছে ; নাদবিন্দুপনিষৎ এই 'ওঁং'কারকে হংস-রূপে কল্পনা করিয়া বলেন,

"ওঁকারো দক্ষিণঃ পক্ষঃ উকার স্তূত্তরঃ স্মৃতঃ মকার স্তস্য পুচ্ছংবা অর্দ্ধমাত্রা শিরস্তথা"

এই ওঁকারের মাত্রা-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রত্যেক মাত্রা কলাত্রয়-বিশিষ্টা অর্থাৎ মাত্রাত্রয়-যুক্তা, সুতরাং ওঁকার দ্বাদশ-মাত্রা বিশিষ্ট হইলেন। অহরহঃ ওঁকারোচ্চারী যোগিগণের এই দ্বাদশ মাত্রার কোন মাত্রায় প্রাণবিয়োগ ঘটিলে কি অবস্থা হয় তাহাও উপনিষদে উক্ত আছে।

নাদবিন্দু-উপনিষৎ বলেন—

প্রথমায়াং তু মাত্রায়াং যদি প্রাণৈর্ব্বিযুজ্যতে
স রাজা ভারতে বর্ষে সার্ব্বভৌমঃ প্রজায়তে।

ওঁকারের প্রথম মাত্রায় যোগীর প্রাণবিয়োগ ঘটিলে তিনি ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌম রাজা হন।

তাহা হইলে জন্মান্তর-বাদী হিন্দু, বেদ-বিশ্বাসী হিন্দু, ভারতেশ্বরকে একজন ঈশ্বর-কল্প মহাযোগীর সাময়িক রূপান্তর না বলিয়া পারেন কি? অথবা তাদৃশ বহুমানাস্পদ নররূপিণী মহতী দেবতার প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠা করিতে পারেন কি? এই ত গেল জন্মান্তরের কথা। ইহ-কালের কথা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, কি বৈদিকযুগ, কি স্মার্ত্তযুগ, কি পৌরাণিক যুগ—কি ইতিহাস—সর্ব্বত্রই রাজা দেবতা-নির্ব্বিশেষে আদৃত ও সম্মানিত। এমন কি সাহিত্য-যুগ, যেখানে কবির অসীম কল্পনার অখণ্ড রাজত্ব, সেখানেও রাজা-প্রজার মধ্যে পিতা-পুত্র ভাব উজ্জ্বলাক্ষরে চিত্রিত; এবং ন্যায় ও ধর্ম্মানুপ্রাণিত রাজশক্তি ভক্তি-প্রবণ প্রজাশক্তির অনন্য-অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া প্রমাণিত। রাজা যে প্রজার ঈশ্বর এ বিষয়ে ভুরি ভুরি প্রমাণ রহিয়াছে, তৎসমস্ত উদ্ধৃত করিতে হইলে প্রবন্ধ অতি বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। বেদ, স্মৃতি ও মহাভারতাদি গ্রন্থ যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের চক্ষে তাহা পিষ্টপেষণ মাত্র হইবে; অতএব তৎসমস্ত উদ্ধৃত না করিয়া আবশ্যকমত বলা যাইবে।

বেদ বলেন—

‘সোমো বৈ রাজা আচক্ষতে’

মনু বলেন—

ইন্দ্রানিলযমার্কানামগ্নেশ্চ বরুণস্যচ
চন্দ্র বিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতী
যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রানাং মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতো নৃপঃ
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা।

ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র ও কুবের এই অষ্টদিক্-পালের সারভূত অংশ গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; ইন্দ্রাদি দেবশ্রেষ্ঠগণের অংশ বলিয়া রাজা অমিত তেজস্বী ও নিয়ন্তা। পঞ্চম বেদ মহাভারত তাঁহার সর্ব্বজ্ঞানাকর গীতাখণ্ডে বলিয়াছেন 'নরাণাং চ নরাধিপং।' ইহা আবার যে সে লোকের উক্তি নহে, স্বয়ং ভগবান্ই এই কথা বলিয়াছেন;

তাহা হইলে বুঝুন, প্রজার নিকট রাজা দেবতা কিনা।

কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস এই শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজা-প্রজাগত প্রতিপাল্য-প্রতিপালক-ভাবকে স্বীয় কবিত্বের ছাঁচে ঢালিয়া অতি মধুর ভাবেই বলিয়াছিলেন যে,—

প্রজানাং বিনয়াধানাৎ রক্ষণাৎ ভরণাদপি
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।

প্রজাগণের বিনয়াধানে ও রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা রাজাই প্রজার পিতা। তাঁহাদের জনক কেবল তাঁহাদের জন্মের হেতু মাত্র। উত্তরচরিতে দেখিয়াছি, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র অকাতরে বলিয়াছিলেন যে,—

স্নেহং সৌখ্যঞ্চ বিত্তঞ্চ যদি বা জানকীমপি
আরাধনায় লোকানাং মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা।

স্নেহ, সৌখ্য, বিত্ত এমন কি, প্রজার সন্তোষের জন্য, প্রিয়তমা জানকীকেও, যদি পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতে আমার ব্যথা নাই।

যিনি প্রজা-সন্তোষের জন্য ঈদৃশ অচিন্তনীয় ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন, তিনি কি প্রজার আরাধ্য দেবতা নহেন? ইহা বলিয়াই আবার ক্ষান্ত হ'ন নাই; আদর্শ সম্রাট্ রঘুকুলচূড়ামণি শ্রীরামচন্দ্র প্রজাগণের ভক্তি-হ্রাসের আশঙ্কায় এত আয়াসলব্ধা, এত প্রিয়তমা, আদর্শসতী ধর্ম্মপত্নী শ্রীসীতা-দেবীকে গর্ভ-মন্থরাবস্থায়ও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

বলুন দেখি,—অকপটে হৃদয় খুলিয়া বলুন দেখি, ঈদৃশ সম্রাট্, প্রজার দেবতা-স্থানীয় হইবার যোগ্য নহেন কি? সাক্ষাৎ দেবতা শ্রীরামচন্দ্রের কথা বাদ দিয়া, দুষ্মন্তের সেই বিরহ-ব্যাকুলাবস্থাতেও ত্যাগ, ঔদার্য্য এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠার কথা শুনিলে কাহার হৃদয় স্বতঃই ভক্তিপ্রবণ না হয়?

নৌবাণিজ্যে বিপন্ন কোন একটি শ্রেষ্ঠীর কথা রাজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় যে, শেঠ অপুত্রকাবস্থায় সমুদ্রগর্ভে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার উত্তরাধিকারী আর কেহ নাই,—এই সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইবার যোগ্য। শকুন্তলা-বিরহ-বিধুর হইলেও মহারাজ তদুত্তরে বলেন, 'আমি জানি শ্রেষ্ঠীরা বহুপত্নীকও থাকে' অতএব আগে দেখা হউক, তাহার

কোন পত্নী অন্তঃসত্ত্বা আছে কিনা? আর ইহাও সাধারণে ডিণ্ডিম (ঢেঁড়া) সহকারে বিঘোষিত করা হউক যে,—

'যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্মন্ত ইতি ঘোষ্যতাং'

প্রজাগণ যে যে স্নিগ্ধ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক বিযুক্ত হইবে, পাপাদৃতে (পতি পত্নীভাব ব্যতীত) সেই সেই বন্ধুর স্থান রাজা দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক পূর্ণ হইবে।

যিনি অপুত্রকের পুত্র, যিনি পিতৃহীনের পিতা, তিনি যে একজন ঈশ্বরানুমোদিত ঐশী শক্তি-সমন্বিত, বহুমানাস্পদ অলৌকিক ব্যক্তি, ইহা না বলিয়া থাকা যায় কি? সুতরাং প্রকৃত হিন্দু, কোনমতে কোনদিকে রাজার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিতে পারেন না।

শ্রুতি, উপনিষৎ, স্মৃতি, পুরাণ, সাহিত্য, ইতিহাসাদির কথা ছাড়িয়া তর্কবাগীশ দার্শনিকগণের সঙ্গে আলাপ করিলে, তাঁহারা যে সমস্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও ব্যবহারিক তত্ত্ব উপন্যস্ত করেন, তাহাও ভাবিবার বিষয়। লাঘব-গৌরব বিচারে অনন্য পারদর্শী তর্কসর্ব্বস্ব তার্কিক বলেন, অনন্তশক্তি-কল্পনা অপেক্ষা কেন্দ্রীভূত একটী সমষ্টি-শক্তি-কল্পনার যথেষ্ট লাঘব অর্থাৎ সুবিধা আছে, সুবিধাপূর্ণ নিরাপদ পথ থাকিতে প্রকৃতিস্থ কোন ব্যক্তি যে, বিপৎ-সঙ্কুল বিস্তীর্ণ কোন পথের পথিক হন না, ইহা বোধ হয় চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অবিসংবাদী সত্য বলিয়া

সাদরে অঙ্গীকার করিবেন, তাই দার্শনিকপ্রবর নৈয়ায়িক স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—

'নানাব্যক্তিষু নানাশক্তিকল্পনায়াং গৌরবম্।'

অর্থাৎ নানা ব্যক্তিতে নানা শক্তি কল্পনায় গৌরব বা অসুবিধা মাত্র; অবশ্য ইহা অভিধাশক্তির অভিব্যক্তি-কালে বলা হইয়াছে। পরন্তু রাজশক্তি-সম্বন্ধেও এই যুক্তি। ঈশ্বরের ইচ্ছা এইরূপ একটী কেন্দ্রীভূত ঐশী শক্তি যথাপাত্রে অর্পিত হইয়া যথারীতি ধর্ম্মনীতিপূর্ণ দণ্ডের সহিত সদ্ব্যবহৃত হউক, এবং সেই শক্তি-সম্পন্ন ক্ষণজন্মা মহাযোগী পুরুষ সম্রাট্ নামে অভিহিত হউন। তাহা না হইলে বিশাল জগৎ বিশৃঙ্খল হইয়া উৎসাদোন্মুখ হইবে, স্বয়ং মনুই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

'অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ বিভুঃ॥'

জগৎ অরাজক হইলে সকলেই ভয়ে কাতর হইয়া পড়িবে, অতএব সমুদয় চরাচর রক্ষার জন্য পরমেশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া ও বিশাল জগতের কথা ছাড়িয়া দিয়া ব্যবহার-দৃষ্টিতে এক একটী বৃহৎ পরিবারের প্রতি লক্ষ্য করুন, অনায়াসে দেখিতে পাইবেন যে, যে পরিবারে সকলেই মালিক, সকলেই স্ব স্ব স্বতন্ত্র শক্তি পরিচালনে বদ্ধপরিকর, তেমন কত শত পরিবার যে, যথেচ্ছাচারে বিশৃঙ্খল হইয়া অচিরে উৎসাদে গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আর দেখিতে পাইবেন,

যেখানে কোন একটী সমষ্টি-শক্তি, ন্যায়, ধর্ম্ম ও সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিয়ত শোভমান রহিয়াছে এবং তাহার অধীনে অসংখ্য ব্যষ্টি-শক্তি স্ব স্ব কর্ত্তব্য-পালনে নিয়োজিত আছে, সে স্থানটী শান্তির দুর্ভেদ্য শিবির ও মা কমলার মঞ্জুগুঞ্জনশীল শিলী-মুখচুম্বিত কমল-বন। অধ্যাত্ম জগতের সম্রাট্ ;—

বৈদান্তিক বলিবেন, বহির্জগৎ পরিত্যাগ করিয়া অন্তরের দিকে লক্ষ্য কর, দেখিতে পাইবে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ— এই বিষয়গুলি যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইয়া এবং বচন, আদান, গমন, বিসর্গ ও আনন্দ এই কার্য্যগুলি যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহিত হইলেও ইহাদের মধ্যে একটীও হৃৎপদ্ম-গোলোকস্থিত দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষ মনকে বাদ দিয়া কার্য্যক্ষম হয় না। স্ব স্ব বিষয়-গ্রহণে ইহাদের শক্তি বিদ্যমান থাকিলেও সমষ্টি-শক্তি সম্পন্ন অন্তঃকরণের তত্তৎকালীন সংযোগব্যতীত ইহারা স্বীয় শক্তির পরিচালনা করিতে অক্ষম। তাই ভগবান্ 'নরাণাঞ্চ নরাধিপং' যেমন বলিয়াছেন, তেমন 'ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চাস্মি' একথাও বলিয়াছেন ; ইহা কল্পিত সিদ্ধান্ত নহে। ব্যবহারতঃ চিন্তাকরুন যে, মন বলিয়া যদি একটা ইন্দ্রিয়ের মালিক না থাকিত এবং চপল-স্বভাব ইন্দ্রিয়গণ যদি স্ব স্ব ইচ্ছায় সব সময় স্বীয়-শক্তি পরিচালনায় ব্যগ্র হইত, তখন কাণ দেখিতে, চক্ষু শুনিতে, নাক রসগ্রহণ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলে, যথেচ্ছাচারের

প্রাবল্যে অন্যান্য ধর্ম্ম-সাঙ্কর্য্য উপস্থিত হইয়া শরীর বিপ্লুত হইয়া পড়িত।

বৈদান্তিকের মতে, ইন্দ্রিয়গ্রাম হইতে আরব্ধ করিয়া মহাপ্রপঞ্চ, ও মহাপ্রপঞ্চ হইতে সেই তুরীয় চৈতন্য পর্য্যন্ত আলোচনা করিলে আমরা ভারতের ব্যবস্থাপক সভা হইতে আরব্ধ করিয়া কমন্স সভা ও কমন্স সভার সহিত সম্রাটের সম্বন্ধ এবং রাজশক্তি যে সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতভাবে থাকিয়া এত বড় বিশাল সাম্রাজ্যকে সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত করিতেছে, ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারিব।

সাংখ্যের মতে, নির্লিপ্ত, অসংশ্লিষ্ট ও উদাসীন পুরুষের সান্নিধ্য-মাত্রে প্রকৃতির কার্য্যকারিতার ন্যায় অসংশ্লিষ্ট ও উদাসীন সম্রাট্-সান্নিধ্যে কমন্স সভার কেন্দ্রীভূত শক্তি যে সুবিশাল সাম্রাজ্যের নিয়মন করিতেছে ইহা আরও সহজে বুঝা যায়। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে, আমরা যে অনন্ত শক্তির অন্তর বিলাস দেখিয়া আপাতঃ মুগ্ধ ও কৃতার্থ হইলেও, যেমন অনির্ব্বচনীয় অনন্য-লভ্য আদি কারণ সেই নিয়ন্তাকেই চরম লক্ষ্য ও আরাধনীয় মনে করি, তদ্রূপ ব্যবহার-জগতে আমরা নানা-শক্তির নানা-লীলা দেখিলেও কেন্দ্রীভূভ শক্তির একমাত্র নিয়ন্তা সেই সম্রাট্ই আমাদের আরাধ্য ও সম্মানার্হ।

আমার মনে হয়, জীব চরম লক্ষ্য ভুলিয়া সংসার-ক্ষেত্রে যেরূপ অশান্তি ভোগ করে—নিষ্কৃতি পায়না, তদ্রূপ রাজনীতি-ক্ষেত্রে অনেকেই চরম লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া অশান্তিকে আহ্বান

করিতেছেন। রাজার প্রতি অশ্রদ্ধা, অভক্তি ও অসম্মান প্রকাশ করিলে কোনওকালে প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গল হয় নাই, হইবেও না।

মনু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

একমেব দহত্যগ্নি নরম্ দুরুপসর্পিনম্
কুলং দহতি রাজাগ্নি স পশু দ্রব্য সঞ্চরম্।
যস্য প্রসাদে পদ্মা শ্রীর্বিজয়শ্চ পরাক্রমে
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়ো হি সঃ।
তং যস্তু দ্বেষ্টি সংমোহাৎ স বিনশ্যত্য সংশয়ং,
তস্য হ্যাসু বিনাশায় রাজা প্রকুরুতে মনঃ।
তস্মাৎ ধর্ম্মং যমিষ্টেষু সব্য ব স্যেন্নরাধিপঃ,
অনিষ্টঞ্চাপ্যনিষ্টেষু তং ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ।

অসাবধান হইয়া যে অগ্নির নিকট যায়, অগ্নি কেবল তাহাকেই দগ্ধ করেন, পরন্তু রাজার কোপাগ্নিতে পতিত হইলে সপরিবারে পশু ও দ্রব্য সম্পত্তির সহিত নষ্ট হইতে হয়। যিনি প্রসন্ন থাকিলে মহতী শ্রী লাভ হয়, যাঁহার পরাক্রম-প্রভাবে বিজয়লাভ এবং যাঁহার ক্রোধ মৃত্যুর বসতিস্থল, তিনি সর্ব্বতেজোময়। তাঁহাকে মোহবশতঃ যে ব্যক্তি দ্বেষ করে, সে নিশ্চয় বিনাশকে প্রাপ্ত হয়। তাহাকে সত্বর বিনাশ করিবার জন্য রাজাও মনোযোগী হন; অতএব রাজা শিষ্টপালন ও দুষ্ট দমনের জন্য যে সকল ধর্ম্ম নিয়ম সংস্থাপন করেন, তাহা উল্লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নয়। দেখা যাইতেছে, কালের কৌটিল্যে আর্য্যভূমি ভারত এই মানবী ব্যবস্থার প্রতি অনেকাংশে ঔদাসীন্য প্রকাশ

করিতেছে। কে বলিতে পারেন যে ভারতে উপস্থিত অশান্তির ইহা একটী অসাধারণ কারণ নহে ?

অসূয়া, অসহিষ্ণুতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, যথেচ্ছাচারিতা, অপরিনামদর্শিতা ও শাস্ত্রাদেশে অনাস্থা যাঁহাদের আদরের জিনিষ, তাঁহাদিগের কথা বলিতে পারি না, নতুবা সদাচারানুবর্ত্তী আর্য্য সন্তান রাজাকে ঈশ্বর-নির্ব্বিশেষে ভক্তি করিতে বাধ্য। হয়ত কেহ কেহ বলিতে পারেন, দেশান্তরে যেখানে প্রজাতন্ত্র ও সাধারণ-তন্ত্রশাসনপ্রণালী পরিচালিত হইয়া বিশাল ভূখণ্ডের নিয়মন করিতেছে, সেখানে একজন রাজা বলিয়া পৃথক্ ব্যক্তির কল্পনার আবশ্যকতা কি ? কথাটা সত্য হইলেও তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে পরিণামে যাহা সিদ্ধান্তিত হইবে, তাহা সেই রাজা ব্যতীত অপর কিছু নহে। মনে করুন—

যেখানে প্রজাতন্ত্র ও সাধারণ-তন্ত্র—শাসন স্বীকার করা যাইতেছে এবং তত্তৎস্থলে যে একটী সভার কল্পনা করা হইয়াছে, সেই সভার সভ্যগণ অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন হইলেও কাহারও নিরপেক্ষ একটী শক্তি কার্য্যকারিণী হয় কি ? হয়না।

সমষ্টিশক্তিই নিয়ন্ত্রী। সেই সমষ্টিশক্তি আবার কোন এক সভ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেনা বা থাকিতে পারেনা ! বাক্যতঃ হউক বা কার্য্যতঃ হউক, এই সমষ্টিশক্তির আশ্রয় অনুসন্ধান করিলে এক সেই রাজা ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। এই সমষ্টিশক্তির আশ্রয়ীভূত সেই রাজাও নিরপেক্ষভাবে তাঁহার সেই শক্তির পরিচালনা করেন না,

করাও অসম্ভব, করিলে, ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট অধিক হইত। হয়ত, পরিণামে একটা বিপ্লবের সূচনা হইত।

অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে সত্য, কিন্তু কাষ্ঠ ও তৃণাদির সংযোগ ব্যতীত যেরূপ সে শক্তির বিকাশ হয় না, তদ্রূপ সেই রাজনিষ্ঠ সমষ্টিশক্তির সভার সহায়তায় কার্য্যকারিণী হয়। স্থূলদর্শিগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহা দেখেন তাহাতেই তাঁহাদের সিদ্ধান্তের উপসংহার করেন; তাই সূক্ষ্ম চিন্তার বিষয়ীভূত মৌলিক তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হন না। কথাটা একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক; কলিকা হইতে অঙ্গার বা টীকা দৈবাৎ পড়িয়া যখন গায়ের কাপড় পুড়িয়া যায়, তখন আমরা বলিয়া থাকি অঙ্গার বা টীকা পড়িয়া কাপড়টা পুড়িয়া গেল; কিন্তু বলুন দেখি—অঙ্গার ত নিরগ্নিদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড; টীকা ত অঙ্গারচূর্ণের সংঘাত; ইহাদের দাহিকা শক্তি কোথায় যে ইহারা দাহ-ক্রিয়া সম্পাদন করিল? এতদুত্তরে অবশ্য বলিতে হইবে জ্বলন্ত অঙ্গার বা জ্বলন্ত টীকা। তাহা হইলে ধরুন, দাহিকা শক্তি সম্পন্ন অগ্নি, যেমন অঙ্গার ও টীকার সহিত প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া কার্য্য করে এবং স্থূলদর্শীদের নিকট পরিচিত হয়না, তদ্রূপ প্রস্তাবিত দেশান্তরীণ শাসক সভার সহিত অভিন্ন হইয়া সেই বিশ্ব-বিশ্রুত ঐশীশক্তি সম্পন্ন কোন ব্যক্তি যে প্রচ্ছন্নভাবে বিশাল ভূ-খণ্ডের নিয়মন করেন এবং স্থূলদর্শিগণের নিকট পরিচিত হননা ইহা একান্ত স্বীকার্য্য! তাই স্থূলদর্শিগণ সভাকেই সর্ব্বস্ব মনে করিয়া চরিতার্থ হয়; পরন্তু অনিচ্ছায় অজ্ঞাতসারে

সেই বিরাট্ রাজভক্তির কার্য্যকারিতাকেই সমর্থন করিয়া থাকে বুঝিতে পারেনা। বেশী দূর যাইতে হইবে না, আজকার ঐ সভায় যদি কেহ অন্তরে কমন্‌স্ সভাকে সর্ব্বে সর্ব্বা ভাবিয়া সম্রাটের প্রতি ফল্গুভক্তি প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকেই বলিতে পারি যে, তিনি কি ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায়, কি আস্থায় -কি অনাস্থায়---বলুন দেখি---জয় কমন্‌স্ সভার জয়! জয় সভাপতি মহাশয়ের জয়!!!

আমার মনে হয় তিনি তাহা কখনই বলিতে পারিবেন না। অবশ্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বলিতেই হইবে---

জয় সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের জয়!

ইহা যে ঈশ-সৃষ্ট পদ্ধতি, ঈশানুমোদিত চিরাচরিত ব্যবস্থা; আজ গায়ের জোরে তাহার অন্যথা ভাব হইবে কি করিয়া? হইতেই পারে না!

অনেকে হয়ত বলিবেন যে, রাম যুধিষ্ঠির দুষ্মন্ত, দিলীপ, প্রভৃতি সম্রাট্‌গণের নামানুকীর্ত্তনে হৃদয় স্বতঃই ভক্তি-প্রবণ হয়; পরন্তু তদিতর ব্যক্তিতে সেরূপ ভক্তির উদ্রেক-হয় না; কিন্তু ইহা বলিবার আগে তাঁহারা তাঁহাদের অন্তঃকরণকে জিজ্ঞাসা করুন, কেন? বোধ হয় উত্তর পাইবেন যে পাত্রের তারতম্য লইয়া ভক্তিরও তারতম্য ঘটিয়াছে; কিন্তু আমরা বলিব, তাঁহারা যদি আর্য্য সন্তান হন, ইহা তাঁহাদের শ্লাঘার বিষয় নহে, অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। আমাদিগকে প্রথমে দেখিতে হইবে যে আমাদের ভক্তির পাত্র কে? সম্রাট্---না, সম্রাটের

হৃদয় ? বোধ হয় সকলেই একবাক্যে বলিবেন যে, সম্রাটের শরীর, ইন্দ্রিয় বা হৃদয় কেহই ভক্তির পাত্র নয়, সম্রাট্‌রূপ আধারে অধিষ্ঠিত এক ঐশীশক্তিই আমাদের আরাধ্য দেবতা; এবং তাঁহার দেহ ও হৃদয় ভক্তি ও সম্মানের অন্যান্য পাত্র।

এই যে আমরা দুর্গোৎসব আরম্ভ করিয়া মৃণ্ময়ী প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করি এবং প্রাণ-প্রিয়তম আরাধ্যা দেবতা বলিয়া তাঁহার প্রতি চিত্তকে এতটা ভক্তিপ্রবণ করি, বলুন দেখি, সেই মৃণ্ময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ও বিসর্জ্জনের পরে আমাদের সেই ভাব থাকে কি ? প্রতিমার প্রতি ততটা ভক্তি বা আস্থা রাখি কি ? প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে মৃণ্ময়ী প্রতিমার উপাদানীভূত মৃত্তিকাকে কারিকরের পদদলিত হইতে দেখিয়াছি; কিছুই বলি নাই; বিসর্জ্জনের পর, প্রতিমাকে নির্ম্মমভাবে জলে নিক্ষিপ্ত করিতে কুণ্ঠাও বোধ করি নাই; কিন্তু মধ্যবর্ত্তী সময়ে যে, প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম পিতা মাতা অপেক্ষাও ভক্তিভাজন ও কল্প বৃক্ষের ন্যায় আশ্রয়নীয় মনে করিয়াছিলাম, সে কাহাকে ? অবশ্যই বলিতে হইবে যে মন্ত্রোদ্বুদ্ধ মৃণ্ময়ী প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত কোন এক অনির্ব্বচনীয় ঐশী শক্তিই আমাদের আরাধ্য এবং ভক্তি ও সম্মানের পাত্র।

ইহা অপেক্ষা আরও সহজে বুঝিতে হইলে বলা যাইতে পারে যে সামান্য গ্রাম্য চৌকিদার হইতে আরম্ভ করিয়া মহামান্য বড় লাট পর্য্যন্ত, যে গবর্ণমেণ্টত্ব দেখিতে পাই, তাঁহা সেই অপরিচ্ছিন্ন রাজশক্তি ছাড়া আর কিছু নহে। ইহা যখন

যে আধারে থাকুক না কেন, আর্য্যসন্তানের নিকট সম্মানার্হ। আমরা আধারকে লক্ষ্য না করিয়াই এই শক্তির সম্মান করিয়া থাকি ; দুঃখের বিষয় বুঝিয়াও বুঝি না ;

রামসিংহ, হনুমানসিংহ যখন চাকুরীর প্রার্থনায় দ্বারস্থ হইয়াছিল, তখন তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিয়াছিলাম ; দৈবাৎ যখন সে কনেষ্টবল হইয়া একখানি ওয়ারেণ্ট হাতে করিয়া "বাবু কঁহাহ্যায়" বলিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহাকে অন্যরূপে দেখিতে লাগিলাম। আবার যখন বেচারী ভাগ্যদোষে কর্ম্মচ্যুত হইল, তখন তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপও করিলাম না। পূর্ব্বাপর অবস্থা আলোচনা করিলে অন্বয় ব্যতিরেকে যে সেই প্রচ্ছন্ন রাজভক্তির সত্তা স্বীকার করা হইতেছে এবং অলক্ষ্যে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইতেছে ইহা না বলিয়া পারা যায় না।—

সামান্য একটা কনেষ্টবলের নিকট রাজশক্তির আংশিক বিকাশ দেখিয়া যদি তাহার প্রতি সম্মান করিয়া থাকি তাহা হইলে সকলের মূলীভূত রাজরাজেশ্বর সম্রাটের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিতে ইতস্ততঃ করিব ; ইহা উপহাসের কথা ; অবজ্ঞার পরিচায়ক, আর্য্যত্বের কলঙ্ক।

এখানে যেমন আধারের গুরুতা লঘুতা বিবেচনা না করিয়া আধেয়ীভূত ঐশী শক্তির সম্মান করিয়া থাকি, তদ্রূপ সম্রাট্ শরীরে প্রতিষ্ঠিত নররূপিণী দেবতা আমাদের চিরারাধ্য, চির

সম্মানের পাত্র। কখনই আমরা তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা করিতে পারি না। ইহাও কল্পিত কথা নহে—মনু বলিয়াছেন –

বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ
মহতী দেবতাহ্যেষো নররূপেণ তিষ্ঠতি।

রাজা যিনি তিনি যবনই হউন, এমন কি বালক হইলেও সামান্য মনুষ্য-বোধে তাঁহার অবজ্ঞা করা উচিত নয়। কারণ তিনি এক মহতী দেবতা মনুষ্যরূপে অবস্থান করিতেছেন মাত্র।

জ্ঞানী নবনীরদকান্তি নবনটবর নন্দনন্দনকে যে চক্ষুতে দেখেন, নৃসিংহ বরাহাদি মূর্ত্তিকেও সেই চক্ষুতেই দেখিয়া কৃতার্থ হন, ভেদ বুদ্ধিতে পরিণাম ভয়ঙ্কর হইয়া থাকে।

তাই বলিতেছিলাম আর্য্য সন্তান কোনও কালে কোনও প্রকারে কোনও সম্রাটকে অবজ্ঞা করিতে পারেন না; করিলে তাঁহার আত্মা কলুষিত হয়। পরিণামে অশান্তি ও অমঙ্গলের সূচনা হয়।

আর অধিক সময় লইবনা; রাজভক্তি ও তোষামোদ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমি আমার বক্তব্যের উপসংহার করিব। রাজভক্তি সূচক কোন একটা ব্যাপার দেখিলে, ইদানীন্তন শিক্ষিতায়মান অনেকেই পরোক্ষে, অপরোক্ষে, প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে বলিয়া থাকেন যে এসব রাজভক্তি নয়, রাজার মনোরঞ্জন মাত্র।

আমরা এতদুত্তরে বলিতে পারি যে ইহা তাঁহাদের অসহি-

ক্ষুতা মাত্র। যাঁহার কর্ত্তব্য বোধ আছে, আত্ম বিস্মৃতি ঘটে নাই, তিনি কখনই একথা বলিতে পারেন না।

লোকে প্রবল কামনা লইয়া কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে, কামনার আংশিক অপূর্ত্তিতে ক্রোধ পরতন্ত্র হয়, ক্রোধবশতঃ সম্মোহী হয়, সম্মোহ বশতঃ অর্থাৎ জেদ হইতে স্মৃতি বিভ্রম ঘটায়, অর্থাৎ তিনি কে তাঁহার কর্ত্তব্য কি, এ বিষয়ে তাঁহার স্মৃতি শক্তি বিলুপ্ত হয়; স্মৃতি বিভ্রম হইলে বুদ্ধিনাশ হয়; অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুদ্ধি একেবারে তিরোহিত হইয়া থাকে; তখন তাহার অকার্য্য বলিয়া আর কিছুই থাকেনা। যথেচ্ছাচার প্রণোদিত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া কত পাপ ও কত নৃশংসতা যে অকাতরে করিয়া থাকে তাহার সীমা থাকেনা।

খরতর করে পৃথিবীকে উপতপ্ত করেন বলিয়া মাধ্যন্দিন মার্ত্তণ্ডকেও যখন চরমাচলের অন্তরালে অস্তমিত হইতে হয়, তখন ছার মনুষ্য, পরোপতাপী হইয়া শান্তিময় ঈশ্বরের পুণ্যরাজ্যে কয়দিন টিকিতে পারে? অমনি হতভাগ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পৈশাচিক তাণ্ডবের উপসংহার করে; সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজ পরিবার ও নিজ দেশকে বিবিধ অশান্তির আবাস ভূমি করিয়া দেয়।

ইহা কল্পিত কথা নহে, স্বয়ং ভগবানই গীতায় বলিয়াছেন,

"* * * কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

বিসদৃশ কামনার আকাঙ্ক্ষায় নানা সূত্রে অকৃতকার্য্য হইয়া যাঁহারা নিজের মনে ক্রোধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং ক্রোধের স্থানে সম্মোহ বা জেদকে আশ্রয় দিয়াছেন—তাঁহাদের স্মৃতি-বিভ্রম ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহারা কে, এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্যই বা কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন।

আমার মনে হয় সমস্ত স্বার্থপর লোক অসহিষ্ণুতা বশতঃ আপনার আচরিতব্য রাজভক্তিকে তোষামোদ বলিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন না; অথবা এই বলিয়া আপাততঃ আত্মবিনোদ করিতেছেন; হয়ত সেই শ্রেণীর শিক্ষিতাভিমানী অনেকেই তাঁহাদের এই উক্তিকে সৎসাহস সদুক্তি বলিয়া সহস্রধা প্রশংসা করিতে পারেন, কিন্তু আমরা ইহাকে অপরিণাম দর্শিতা বা অসমীক্ষ্যকারিতা ছাড়া কিছুই বলিতে পারিনা।

যাঁহারা স্বার্থের সহিত রাজভক্তির বেচা কেনা করিয়া জীবনকে চরিতার্থ করেন তাঁহাদের কথা পৃথক, নতুবা নিষ্কাম-ভাবে কর্ত্তব্য বোধে অর্থাৎ ঈশ্বরের অংশ সেই রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কোন ফলের আশা না রাখিয়া বরং না করিলে কর্ত্তব্যচ্যুতি জন্য প্রত্যবায় আছে মনে করেন তাঁহারা কখন কোনকালে কোন অবস্থাতে রাজার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিতে পারেন না।

অতএব এস ভাই ভারতবাসী এ হেন শুভদিনে হিংসা, প্রতিহিংসা, দ্বেষ, অসূয়া, অশান্তি সব পরিত্যাগ করিয়া সমস্বরে সকলে হৃদয় খুলিয়া বলি—

জয় সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের জয়

জয় মহারাণী মেরীর জয় !

ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করুন দয়াময় বিভু, আমাদের নবীন সম্রাট্‌কে পুত্র কলত্র সহ দীর্ঘজীবী ও তাঁহার কর্ম্মপথকে নিষ্কণ্টক করুন এবং তাঁহার এই গুরুতর দায়িত্ব পূর্ণ পরম গৌরবময় সম্রাট্ পদবীকে সার্থক করুন।

স্বার্থের ব্যাঘাত দেখিলে যাঁহারা মাতা পিতা গুরু প্রভৃতি পূজনীয়বর্গকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন ও শ্রীষ্টদেবার্চ্চনাদি আর্য্যধর্ম্ম যাঁহাদের নিকট বুজুরুকী বলিয়া প্রতিপন্ন এমন কি নিজের নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা বন্দনাদিকে যাঁহারা অপকর্ম্ম বলিয়া বহুদিন পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন সেই সমস্ত শাস্ত্রবিধি-বিদ্বেষী অপরিণামদর্শী ব্যক্তি-বর্গের সহিত আমরা একমত হইতে পারিনা পারিবও না তাঁহারা আমার এই ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন।

সমবেত সভ্যমণ্ডলি ! সমবেত ছাত্র ও পাঠকবৃন্দ ! আবার সকলে সমস্বরে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর জয় গান করি আসুন !

জয় মহারাণী মেরীর জয়

জয় সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের জয় ! ! !

ভূস্বামিগণের ভবিতব্যতা।

অসিত পক্ষের ঐন্দবীকলার ন্যায় দিনে দিনে রাজা ও জমিদারবর্গ কেন যে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে চলিয়াছেন, অনেক সময় ইহা ঐকান্তিক চিন্তার বিষয়ীভূত হয়। অচিন্তনীয় বিষয়ের আকস্মিক আবির্ভাব দেখিলে তাহার কারণ অনুসন্ধান করা মানুষের স্বাভাবিক, তাই হৃদয়ে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, যে ভূস্বামিনিচয় একদিন উপচয়ের অনন্য আস্পদ হইয়া দেশের দৃঢ়তর ভিত্তিস্বরূপ ছিলেন এবং দেশের আশ্রয় ভরসাস্থল ছিলেন, আজ তাঁহাদের মধ্যে প্রায় শতকরা পঁচানব্বই জন এতাদৃশ দীনদশার ক্রীতদাস হইলেন কেন?

প্রণিধান করুন, দেখিতে পাইবেন, কেহ আজ আবহমান কালের অধিকৃত ভূসম্পত্তিটী দেনার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া পথের কাঙ্গাল, কেহবা নিরপত্য হইয়া পুন্নাম নরকের ভীষণ যন্ত্রণায় অকালে কালের কবলে কবলিত, কাহারও বা পৈতৃক পৃথিবীটি উত্তাল তরঙ্গমালাকুল অকূল জলধি বক্ষে বাত্যান্দোলিত ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায় প্রনাণাধিক দেনায় যায় যায় করিতেছে। অকস্মাৎ কেন যে এরূপ হয়, ইহা ভাবিবার বিষয় নহে কি?

বলিতেও হৃদয় আঘাত প্রাপ্ত হয়। বেশিদিন নহে, অল্প দিন পূর্ব্বে যেখানে হিমাচলের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ সদৃশ সৌধাবলী আকাশ ভেদ করিয়া শোভা পাইতেছিল, আজ সেখানে দুর্ব্বা-

হুরাচ্ছাদিত স্তূপীভূত ভগ্ন ইষ্টকরাশি, স্বজনবর্গের সানন্দ কোলাহলের বিনিময়ে শিবাকুলের বিকট চীৎকার, গৌরাঙ্গীর সুরম্য হর্ম্ম্য—ভুজঙ্গীর ভীষণ গর্ত্ত, আর অসংখ্য যাচকের দেহি দেহি শব্দের পরিবর্ত্তে গভীর নিশীথে আজ পেচককুলের পৈশাচিক শব্দ মূর্ত্তিমান্।

অন্যদিকে দৃক্‌পাত করুন, দেখিতে পাইবেন, যিনি একদিন ইহজীবনেই ধনে মানে দেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া শত শত যাচকের মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করিয়া জয় শব্দের পাত্র হইয়াছিলেন, তিনিই আজ নির্ধন, নিরন্ন, এমন কি একবস্ত্র হইয়া ভিখারীর বেশে চির-প্রতিপালিতের দ্বারস্থ। ইহা ব্যতীত আর এক শ্রেণী দেখিতে পাইবেন, যাঁহারা দেনার জালায় জর্জ্জরিত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়াছেন ও সম্পত্তিটী ভৃত্যের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। নিজের অধিকার নাই। এমন কি স্বয়ং পর্য্যন্ত ভৃত্যের অধীন,—ভৃত্যের ক্রীড়া কন্দুক। হায়, কেন এরূপ হয়? অনেক হৃদয়বান্ পুরুষ অনেক সময় ইহার কারণ অনুসন্ধিৎসু হইয়া কেহ বলেন সংশিক্ষার অভাব, কেহ বলেন, চাটুকারের অমোঘ বাগুরা, কেহ বলেন অহরহঃ অসৎ সংসর্গ এবং কেহ কেহ বলেন ব্যসনের আতিশয্যই এ অধঃপাতের অনন্য কারণ। শাস্ত্রকারেরা—

দ্যূত মাংস সুরা বেশ্যা খেট চৌর্য্যপরাঙ্গনাঃ।
মহাপাপানি সপ্তৈব ব্যসনানি ত্যজেদ্বুধঃ॥

দ্যূত, মাংস, সুরা, বেশ্যা, খেট (মৃগয়া) চৌর্য্য ও পরস্ত্রী

এই সাতটী ব্যসন বলিয়া নির্ব্বাচিত করেন। ব্যসনী ব্যক্তির নাশ যে অবশ্যম্ভাবী, তাহার প্রমাণার্থ তাঁহারা দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার এই পদ্যটী দৃষ্টান্তস্বরূপে ব্যবহার করেন।

দ্যূতাৎ ধর্ম্মসুতঃ পলাদিহবকো মদ্যাদষ দোর্ণন্দনাঃ।
চোরঃ কামবশান্মৃগান্ত করণাৎ স ব্রহ্মাদত্তো নৃপঃ॥
চৌরত্বাৎ শিবভূতিরন্য বনিতা সঙ্গাদ্দশাস্যো হঠাৎ।
একৈক ব্যসনাহতা ইতি নরাঃ সর্ব্বৈর্ণ কো নশ্যতি॥"

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অক্ষ ক্রীড়ায়, ধর্ম্ম বক মাংসলোভে, যদুনন্দনগণ মদ্যপানে, চোর (সুন্দর) কামবশে, রাজা মৃগয়ায়, শিবভূতি চৌর্য্যে এবং অন্য বনিতা সহবাসেচ্ছায় লঙ্কেশ্বর দশানন বিপন্ন হইয়াছেন। ইহারা এই এক একটী মাত্র ব্যসনে এতাদৃশ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। সব কয়টী একাধারে বর্ত্তমান থাকিলে কে না বিনস্ট হয়?

সৎশিক্ষার অভাব, চাটুকারের চাটুক্তি, অসৎ সংসর্গ ও ব্যসন বা বিলাসিতা এই চারিটীই ভূস্বামিগণের অধঃপতনের সাক্ষাৎ ও পরম্পারায় অব্যভিচারী কারণ সন্দেহ নাই। কারণ সংশিক্ষার অভাব বশতঃ সদসদ্বিবেক লুপ্ত হয়। সদসদ্বিবেক না থাকিলে চাটুকার আর প্রকৃত হিতৈষীর পরিচয় শক্তি তিরোহিত হইয়া থাকে। তখন তোষামোদপরায়ণ নরপিশাচবর্গের আপাতমধুর বাগ্‌জালে আত্মপ্রশংসালোলুপ অন্তঃকরণটী আবদ্ধ হয়। চাটুকারের সংখ্যা একে একে বৃদ্ধি পায়। প্রতিহারী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধান অমাত্য পর্য্যন্ত সকলেই

মনিবের মনোরক্ষার্থ চাটুকার সাজিতে বাধ্য হন। সে অবস্থায় সুহৃদের সৎপরামর্শ তপ্ত কটাহে জলবিন্দুর ন্যায় ক্ষণমাত্র স্থান পায় না। প্রত্যুত ঘোর শত্রুতার সূত্রপাত করে।' কাজে কাজেই তৎকালে প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্‌গণ বিরাগের পাত্র হইয়া বিতাড়িত হন। অসংখ্য চাটুকারে দুর্গ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। যে ভূস্বামীর চালক চাটুকার তাঁহার আর পরিণাম বলিতে হইবে না, স্বয়ং নীতিশাস্ত্রকারই বলিয়াছেন—

"কো বা দুর্জ্জন বাগুরাসু পতিতঃ ক্ষেমেণ জাতঃ পুমান্।"

দুর্জ্জনের বাগজালে পতিত হইলে কে বা সুখে কালাতিপাত করিতে পারিয়াছে? কেহই নহে। চাটুকারের দল প্রাবল্য লাভ করিলে সতের সত্ত্বা আর থাকে না। স্বার্থপরায়ণ, ভণ্ড, পাষণ্ড, ক্লীব, কীলক প্রভৃতি অসংখ্য অসৎ অনুচর অনুক্ষণ আজ্ঞাবহ হইয়া প্রভুর বল, মেধা, ধন, ধৈর্য্য, বীর্য্য অপহরণ করিয়া থাকে। সে কাপুরুষনিচয়ের নীচ ব্যবহার বিশদ্‌ভাবে ব্যাখ্যাত করিয়া লেখনীকে দূষিত ও কলঙ্কিত করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। কেবল কীলকের কদর্থটাকে কথঞ্চিত লিপিবদ্ধ করিয়া বিরত হইলাম।

"সকীলক ইতি প্রোক্তো যঃ ক্লৈব্যাদাত্মনঃ স্ত্রিয়ং।
অন্যেন সহ সংযোজ্য পশ্চাৎ তামেব সেবতে॥"

যে নিজের স্ত্রীকে অন্যের সহিত সংযুক্ত করাইয়া পশ্চাৎ তাহাকে গ্রহণ করে, তাহার নাম কীলক। ধিক্ তাহাদের মনিবের মনোরক্ষা! আর ধিক্ তাহাদের সেই কদর্য্য উপার্জ্জন!

এইরূপে অসৎ সংসর্গের মাত্রা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। অসৎ সংসর্গে না হইতে পারে এরূপ অধঃপাতই নাই। শাস্ত্রকারেরা বলেন—

অপনয়তি বিনয়মনয়ং জনয়তি ক্ষয়ং সততং যশসঃ।
নিরয়ং চয়তি তরসা পুংসা ; মসতঃ সমাগমো জগতি ॥

অসতের সংসর্গ বিনয়ের অপনয় হয়, যশের ক্ষয় হয় এবং নিরয়ের সঞ্চার হয়। সুতরাং ব্যসন বাসনা বিশ্বতোমুখী হইয়া পড়ে। পূর্ব্বোক্ত ব্যসন সপ্তকের মধ্যে একবার যদি দুই একটী প্রশ্রয় পায়, গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় অমনি অবশিষ্ট সব কয়টী আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। এইখানে কাব্যদীপিকার হাস্য-রসে উদাহৃত শ্লোকটী মনে আসে। কেহ একজন কোন মাংসলোলুপ ভিক্ষুককে মাংস ভোজন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন ;—

ভিক্ষো ! মাংস নিষেবনং প্রকুরুষে ?
কিংতেন মদ্যং বিনা মদ্যং চাপিতব প্রিয়ং ?
প্রিয় মহো বারাঙ্গনাভিঃ সহ। তাসামর্থরুচিঃ কুতস্তব ধনং ?
দ্যূতেন চৌর্য্যেণ বা ; চৌর্য্য হত পরিগ্রহোঽপি ভবতো ?
নষ্টস্য কাঽন্যাগতিঃ ?

প্রশ্ন—ভিক্ষো ! মাংস ভোজন করিতেছ ?
উত্তর- হাঁ, কিন্তু বিনা মদে তাহা বৃথা।
প্রশ্ন—মদও কি তোমার প্রিয় ?
উত্তর—অহো ! বারাঙ্গনাগণের সহিত প্রিয়।

প্রশ্ন—তাহারা যে অর্থাভিলাষিণী, তোমার অর্থ কোথায় ?

উত্তর—দ্যূত বা চৌর্য্যের দ্বারা।

প্রশ্ন দ্যূত ও চৌর্য্য তোমার আয়ত্ত নাকি ?

উত্তর—আরে ভাই নষ্টের আর অন্য গতি কি ?

একজন বিলাসী (ব্যসনী) ভিক্ষুকের উক্তি যখন এতাদৃশ, তখন অসংখ্য অসৎ পরিবৃত সমৃদ্ধিশালী বিলাসী যুবকের আর কথা কি ? অথবা ব্যসন জন্য অধঃপতন সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত যুক্ত্যন্তরের অবতারণা করা অনাবশ্যক। সাধারণের চক্ষে শত শত ধর্ম্ম বক, শত শত সুন্দর, শত শত ব্রহ্মাদত্ত, শত শত শিবভূতি, শত শত দশানন নিত্য নিত্য অবভাসিত হইতেছেন। তবে ভূস্বামিনিচয়ে চৌর্য্যটা হঠাৎ সংক্রমিত হয় না সত্য, কিন্তু চৌর্য্যের বিনিময়ে তাঁহারা যে ভীষণ ঋণের সৃষ্টি করেন, সেই ঋণ একদিন তাহাদিগকে পাটচ্চর হইতেও অধম পদবীতে নীত করে। তাহার কারণ এই যে, যখন পাষণ্ড-গণের পাশব প্ররোচনায় ইহাদের বিলাসের মাত্রা ক্রমে বর্দ্ধিত হয়, তখন ইহারা সর্ব্বপ্রথমে পিতৃপিতামহের বহু কষ্টোপার্জ্জিত সঞ্চিত সদর্থরাশিকে আহুতিস্বরূপ নিক্ষিপ্ত করিয়া ব্যসনবহ্নিকে দ্বিগুণিত করেন। পূর্ণাহুতি না দিয়া বাসনা পূর্ণ হয় না; অগত্যা উত্তমর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ঋণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, সর্ব্বশেষে যথা সর্ব্বস্ব উত্তমর্ণে অর্পিত করিয়া সর্ব্বস্ব দক্ষিণ যাগ সমাহিত করেন।

ইহজীবনেই উচ্চাসন, ব্যসন, অধঃপতন ও অবমানন সংঘটিত

হইয়াছে, এতাদৃশ কয়েকজনই আমাদের দৃষ্টি পথের পথিক হইয়া আমাদিগকে যুগপৎ ভীত, ব্যথিত ও বিস্মিত করিয়াছেন। অহো অপরিমিত অনিয়ত বিলাসের কি ভয়ঙ্কর পরিণাম! পাপ ব্যসন বাসনার কি অনির্ব্বচনীয় বশীকরণ শক্তি! লঙ্কেশ্বর সর্ব্বস্ব হারাইয়া যাচকবেশে পরের দ্বারস্থ; তথাপি তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয় নাই, তখনও তিনি বুদ্ধি থাকিতে জড়, চক্ষু থাকিতে অন্ধ হইয়া রহিয়াছেন, হরি! হরি! তাদৃশ অবস্থাতেও ভিক্ষালব্ধ ধনে তিনি চিরসহচরী সুরাদেবী ও বারনারীর অর্চ্চনায় নিরত।

এই পাপব্যসনপরম্পারা কেবল এক পুরুষেই যে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া বিরত হয়, তাহা নহে। ব্যসনীর পুত্র-পৌত্রাদিতেও বিষময় ফল প্রসব করিতে থাকে। নিরপত্যতা, নির্ব্বিন্নতা, চিররোগিতা প্রভৃতি বিবিধ বিপত্তিই এই বিলাসিতা বা ব্যসনের পরম্পারাগত বিষময় ফল।

অনিয়ত বেলায় অনুপযুক্ত মাত্রায় সুরাপান, দূষিত মাংস ভক্ষণ এবং সপ্তধাতুর সার স্বরূপ শুক্র ধাতুর অপরিমিতরূপে অকালে ক্ষয়, বহু রোগের নিদান। চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, শার্ঙ্গধর প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্যচিকিৎসকগণ ও ইয়োরোপীয় খ্যাতনামা কার্পেণ্টার, ক্লার্ক, লেমাট, রবার্টসন প্রভৃতি ভূয়োদর্শী ডাক্তারগণ স্ব স্ব বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাবলীতে স্পষ্টাক্ষরে এইগুলির মহীয়সী অপকারিতা বিবৃত করিয়াছেন।

তাঁহারা বলেন, অযথাভাবে মদ্য মাংস নিষেবিত হইলে

যকৃৎ বিকৃত হইয়া অকালে ইহলোক হইতে অপসারিত করে, অপরিমিতরূপে শুক্রক্ষয় হইলে যদি একবার ধাতুদৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কি শারীরিক কি মানসিক উভয়বিধ যাবৎ বিকৃতিই ক্রমশঃ আসিয়া উপস্থিত হয়।

বাতরক্ত, শূল, উদাবর্ত্ত, আনাহ, গুল্ম, মলকৃচ্ছ্র, বহুমূত্র, ত্রয়োদশ প্রকার মূত্রাঘাত, অশ্মরী, নানাবিধ প্রমেহ, সোমরোগ প্রমেহ, পীড়কা, বিদ্রধি, ভগন্দর, অর্শ, উপদংশ, শূকদোষ, বহুবিধ কুষ্ঠরোগ, বিসর্প, বিস্ফোটক, মুখরোগ, কর্ণরোগ, অষ্টসপ্ততি প্রকার নেত্ররোগ, একাদশ প্রকার শিরোরোগ এবং ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি ভীষণ নরক-যন্ত্রণাদায়ক দুঃসাধ্য ও অসাধ্য রোগ সকল সেই মহাপাপেরই পরিণাম। ইহা চরকাচার্য্য প্রভৃতির মত।

ডাক্তারগণ বলেন, মুখমণ্ডলে ব্রণ, শরীরের নানাস্থানে কণ্ডূ ও বিস্ফোটক, নয়নোপান্তে নীলিমা, কপালস্থ চর্ম্মের সঙ্কোচ ও শৈথিল্য, শরীরের নানা স্থানে শিরার উদ্গম, শ্মশ্রুর বিরলতা, চক্ষু নিমজ্জন, মুখের কান্তিনাশ, স্বরের বিকৃতি, সুপ্তিস্খলন (স্বপ্নদোষ), পৃষ্ঠে ও মস্তকে বেদনা, দৃষ্টিক্ষীণতা, মল মূত্রত্যাগ কালে বীর্য্যক্ষয়, শুক্রাধার কোষদ্বয়ের বিষমাকৃতি ও লম্বিতাবস্থা, নিদ্রাহানি, সর্ব্বদা তন্দ্রা, আলস্য, অপস্মার, বিমর্ষ, দীর্ঘনিশ্বাস, হৃৎকম্প, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, মূর্চ্ছা, জীর্ণজ্বর, ক্ষয়কাস, পাকস্থলী ও অন্ত্রসমূহে এবং শরীরে প্রত্যেক সন্ধিস্থলে অসহ্য বেদনা, জননেন্দ্রিয়ের বিকৃতি, শক্তিহীনতা ও অকর্ম্মণ্যতা, মনোবৃত্তিসমূহের দুর্ব্বলতা, স্মৃতিশক্তির বিলোপ, মনের চঞ্চলতা, বিবেচনাশক্তির

অভাব, বুদ্ধিভ্রংশ, ক্ষণিক ক্ষিপ্ততা, অশান্তি ও বিরক্তি, আত্ম-গ্লানি, আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা, শিরোঘূর্ণন, মনের ক্লেশে নিয়ত অশ্রুপাত, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিশেষতঃ দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, নিদ্রাহীনতা, দুঃস্বপ্ন, নিয়ত ভীতি ইত্যাদি সব কয়টীই সেই ধাতুদৌর্ব্বল্যের বিষময় ফল।

উল্লিখিত চিকিৎসকেরা লিখিয়াছেন, জননেন্দ্রিয়ের সহিত মস্তিষ্কের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। জননেন্দ্রিয়ের বিকৃতি হইলেই মস্তিষ্কেরও বিকৃতি ঘটে; আর মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিলেই মনুষ্যত্ব নাশ বা সর্ব্বনাশ হয়।

বিলাসোন্মত্ত অনভিজ্ঞ অপরিণামদর্শী যুবা ব্যসনের নেশায় অহরহঃ আমোদপরতন্ত্র হইয়া উল্লেখিত নিদাননিচয় বুঝিয়াও ত বুঝেন না। অধিকন্তু আরও কয়েকটী ভীষণ নিদান তাহার সহিত সংযোজিত করেন। বিলাসের পরিপূর্ণতা প্রতিপাদনার্থ ইহাদিগকে বাধ্য হইয়া অনুদিন রাত্রি জাগরণ, দিবা শয়ন, অসাময়িক ভোজন ও অবগাহন ইত্যাদি আশু অস্বাস্থ্যকর অকৃত্য-কলাপের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

এতাদৃশ অকালজ্ঞ উলূকরূপী ব্যসনী যুবা অর্থাৎ যাঁহারা দিবাকে রাত্রি এবং রাত্রিকে দিবা করিয়া আর অনিয়ত বেলায় ভোজনাবগাহন করিয়া স্বীয় অসাধারণতার ডিণ্ডিম বিঘোষিত করিতেছেন, তাদৃশ অসংখ্য অবিমৃষ্যকারী নিয়তই নয়নাগ্রে নৃত্য করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে বিশদ লেখা অনাবশ্যক।

একেতো সুরা, মাংস, বারাঙ্গনা, পরাঙ্গনা ছিল, তাহার উপর

আশু অস্বাস্থ্যকর রাত্রি জাগরণাদি নিদান নিচয় যোগদান করিয়া মাত্রার পূর্ণতা প্রতিপাদন করিল, নিদান পূর্ণমাত্রায় অবতীর্ণ হওয়ায় ক্রমে তত্তৎ নিদানজনিত এক একটী দুরারোগ্য রোগের সূত্রপাত হইতে লাগিল। রোগপরম্পরা সত্ত্বেও যুবক ঠেকিয়া শিখিলেন না, বুঝিয়া বুঝিলেন না, চিরাভ্যাসবশতঃ সেই বিষময় নিদান পূর্ব্ববৎ পূর্ণমাত্রায় সেবন করিতে প্রবৃত্ত থাকিলেন।

কিন্তু হায়! সে আর কয়দিন, ক্রমে বিষক্রিয়া মজ্জা পর্য্যন্ত অধিকার করিল; শরীর ও ইন্দ্রিয়-গ্রাম জর্জ্জরিত হইল; সর্ব্ব প্রথমে যুবা স্বর্গীয় সুখ-স্বাস্থ্যটীকে বিসর্জ্জন দিয়া বসিলেন।

স্বাস্থ্যের অভাববশতঃ যুবকের আয়ু, ধন, ধর্ম্ম, মেধা ইত্যাদি যাহা কিছু মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, সবই অন্তর্হিত হইল।

তাহাতে কেহ জননেন্দ্রিয়ের বৈকল্য নিবন্ধন সন্তানোৎপাদিকা-শক্তি হারাইয়া পুন্নাম নরকের পথ পরিষ্কার করিলেন। কেহ অসহায় আত্মীয়বর্গকে অকূলে ভাসাইয়া অকালে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন, কেহ অসাধ্য রোগের অসহ্য যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইয়া জীবনের অসারতা উপলব্ধি করিয়া আত্মঘাতী হইতে উদ্যত হইলেন; কেহবা নানাবিধ বিষাক্ত ঔষধ সেবন করিয়া দিন কয়েকের জন্য কথঞ্চিৎ স্বয়ং স্বাস্থ্যলাভ করিলেও বিকৃত বিষ-সম্পৃক্ত বীর্য্যে যে কয়টী সন্তান সন্ততি উৎপাদন করিয়া গেলেন, তাহাদের মধ্যে কেহবা অল্পায়ু, কেহবা চিররোগী, কেহবা বিকলাঙ্গ হইয়া পিতার ন্যায় জ্বালাময় জীবনলাভ করিল।

এই পুত্রপৌত্রগণ যখন যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিল, তখন বয়োধর্ম্মবশতঃ কথঞ্চিৎ প্রবৃদ্ধবীর্য্য হইলেও আদর্শস্থানীয় পিতৃপিতামহের গুণানুচিন্তন করিয়া সেই নজিরে সেই সব ব্যসনের দাসত্ব স্বীকার করিল। একে চিররোগী, হীনবীর্য্য, তাহার উপর বিষময় ব্যসনের পূর্ণমাত্রা; জীর্ণ তরণী জলধির উত্তাল তরঙ্গে কয়দিন আর অস্তিত্ব লাভ করে? ক্রমান্বয়ে তাহারা বিলাসীর বিলাসময় অঙ্কের বিনিময়ে কালের কণ্টকময় ক্রোড়ে শায়িত হইল। ব্যসনী পিতৃ-পিতামহের সমারব্ধ ব্যসন-নাটকের এইখানেই যবনিকা পাত হইল। চিরদিনের জন্য চিরন্তন বংশটী লোপ পাইল।

যিনি যাহাই বলুন, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া পূর্ব্বোক্ত কারণচতুষ্টয়কে আপাততঃ অব্যভিচারিরূপে অভিহিতকরা অসঙ্গত নহে। যাউক্ তাহার পুনরুদ্ঘাটন নিষ্প্রয়োজন।

উপসংহারে ব্যক্তব্য, হে ব্যসনবশীভূত! ঋণার্ত্ত! আধি ব্যাধিপ্রপীড়িত! ভূস্বামিবৃন্দ! অধিক আর কি বলিব, প্রবন্ধের প্রথমে যে কয় শ্রেণী ভূস্বামীর মর্ম্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা যদি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং পূর্ব্বোক্ত দুর্লক্ষণ লক্ষিত ভূরি ভূরি ভূস্বামীর শোচনীয় ভয়ঙ্কর পরিণাম দেখিয়া ও শুনিয়া যদি আপনাদের অন্তরে অধুনা অণুমাত্র প্রতিচিকীর্ষার ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর ভবিতব্যতার দোহাই দিয়া নিদ্রিত থাকিবেন না। সৎশিক্ষার সুব্যবস্থা করুন, চাটুকারের চাটুক্তিরূপ কালকূট হইতে চিত্তকে রক্ষা করুন, ভণ্ড

পাষণ্ড আদি অসৎ সংঘকে অচিরে বিতাড়িত করিয়া দুর্গকে নিষ্কলুষ করুন, প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী স্পষ্টবক্তা প্রবীণ সজ্জন-নিচয়ে দুর্গ সমলঙ্কৃত করুন, এবং মহাপাপ ব্যসন-সপ্তকের সমূলোৎপাটন করিয়া পরমেশ্বরে পরমাভক্তি স্থাপন পূর্ব্বক পবিত্র আনন্দ অনুভব করুন। দেখিবেন, অচিরে উপরাগান্তে শশাঙ্কের রোহিণী যোগের ন্যায় আবার সেই শান্তি, সম্পত্তি সমাদরে স্বয়ং সমালিঙ্গন করিবে।

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন, অনেকে অশিক্ষিত হইয়াও বিশাল সম্পত্তির অধীশ্বরতা করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং শিক্ষার অভাব যে ভূস্বামিগণের ভীষণ ভবিতব্যতা ও শোচনীয় পরিণামের বিশিষ্ট কারণ, ইহা বলা যাইতে পারেনা। কথাটা আপাত-সত্য, কিন্তু সেই প্রাচীন প্রবীণ মহাত্মাগণের তাদৃশ সংশিক্ষা না থাকিলেও সংশিক্ষা জন্য যে সদ্‌জ্ঞান, তাহা তাঁহাদের বিলক্ষণ ছিল। তাঁহারা দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞের পূজন, অতিথি-সংকার, শুচিতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, অনুদ্বেগকর বাক্য, অপ্রিয় সত্য, বেদাভ্যাস, মনঃপ্রসাদ, আত্মনিগ্রহ ইত্যাদি সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন।

তাঁহাদের নীতি বা স্মৃতিশাস্ত্রে প্রচুর পাণ্ডিত্য না থাকিলেও তাঁহাদের সদুদ্যম, সৎসাহস, ধৈর্য্য, শক্তি, বুদ্ধি ও পরাক্রম বিলক্ষণ ছিল। তাঁহারা জানিতেন—

উৎসাহসম্পন্নমদীর্ঘসূত্রং ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তম্।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়নিশ্চয়ং চ, লক্ষ্মীঃ স্বয়ং বাঞ্ছতি বাসহেতোঃ ॥

অর্থাৎ "যাহার উৎসাহ আছে, ক্রিয়া বিধির জ্ঞান আছে, শৌর্য্য আছে, কৃতজ্ঞতা আছে ও দৃঢ় নিশ্চয়তা আছে এবং যে ব্যক্তি অদীর্ঘসূত্রী ও ব্যসনে অনাসক্ত, লক্ষ্মী আপনিই বাস করিবার জন্য তাদৃশ পুরুষের কামনা করেন।"

তাহারা শিক্ষিত স্পষ্টবক্তা হিতৈষীকে সাদরে সহচর করিতেন। কারণ তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল—

স কিং সখা সাধু ন শাস্তি যোঽধিপং
হিতান্ন যঃ শৃণুতে স কিং প্রভুঃ।
সদানুকূলেষু হি কুর্ব্বতে রতিং
নৃপেষ্বমাত্যেষু চ সর্ব্ব সম্পদঃ॥

অর্থাৎ যিনি স্বীয় প্রভুকে সাধু উপদেশ না দেন, তিনি কুৎসিত সখা আর, যে প্রভু হিতোপদেশ শ্রবণ না করেন, তিনিও কুৎসিত। নৃপ ও অমাত্য পরস্পর অনুকূল থাকিলে সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তিই সেখানে অনুরাগিণী হয়।

তাঁহারা গল্প পুদ্গল (কার্য্যক্রমানভিজ্ঞ) মন্ত্রীর মন্ত্রণা গ্রহণ করিতেন না। যাঁহারা স্থিত কার্য্যের সমুদ্ভব, ভবিষ্য কার্য্যের সম্ভব ও অনর্থ কার্য্যের প্রতিঘাতার্থ মনন করেন, তাঁহাদিগকে মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করিতেন। আত্মম্ভরি, বাক্যবাগীশ অশিক্ষিত অসৎ অনুচর তাঁহাদের পার্শ্বে স্থান প্রাপ্ত হইত না। ব্যসন তাঁহাদের ত্রিসীমা স্পর্শ করিত না। তাঁহারা—

নিয়োগি হস্তার্পিত রাজ্যভারা
স্তিষ্ঠন্তি যে শৈলবিহারসারাঃ।

বিড়াল বৃন্দাহিত দুগ্ধকুম্ভাঃ
স্বপন্তি তে মূঢ় ধিয়ঃ ক্ষিতীন্দ্রাঃ ॥

"যাহারা ভৃত্যের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া শৈলবিহার-মাত্রপরায়ণ হইয়া অবস্থিতি করে, সেই সকল মূঢ়বুদ্ধি নরপতি বিড়ালবৃন্দের নিকট দুগ্ধকুম্ভ স্থাপন করিয়া নিদ্রা যায়।"

তাঁহারা এই সমস্ত উপদেশের অক্ষরে অক্ষরে সত্যতা উপলব্ধি করিতেন। তাই তাঁহারা শাস্ত্রমর্য্যাদানুসারে স্বাধিকৃত পৃথিবীকে পরিণীতা পত্নীর ন্যায় একান্ত রক্ষণীয়া মনে করিতেন। রক্ষাও করিতেন। পরিণীতা পত্নীর ন্যায় পৃথিবীকে অন্যের অধিকারে অর্পিত করিতে তাঁহারা লজ্জাবোধ করিতেন। তাঁহাদের সময়ে দুর্গের অভ্যন্তরে ও বাহিরে পৈশাচিক তাণ্ডব ছিল না, তাঁহাবা প্রাণাপেক্ষা প্রিয় করিয়া কুলধর্ম্মকে রক্ষা করিতেন। কারণ—

"ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত
অধর্ম্মাঽভিভবাৎ কৃষ্ণ! প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয়! জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্ত পিণ্ডোদক ক্রিয়াঃ ॥

কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট সমস্ত কুল অধর্ম্ম দ্বারা অভি-ভূত হয়। অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলে কুলস্ত্রীগণ দূষিত হইয়া উঠে। স্ত্রীগণ দূষিত হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। সঙ্কর হইলে সেই কুল এবং কুলনাশক দুরাত্মাদিগের নরক হইয়া থাকে,

তখন তাহাদের পিতৃগণ লুপ্তশ্রাদ্ধ হইয়া ঘোর নিরয়ে নিপতিত হয়েন। এই সমস্ত ভগবদুক্তিতে তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অধিক বলা অনাবশ্যক; তাঁহাদের যশস্বী দীর্ঘজীবনই তাহার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত স্থল।

তাই বলিতেছিলাম, আদর্শস্থানীয় প্রাচীন ভূস্বামিবৃন্দের তাদৃশ শিক্ষা না থাকিলেও সহজজ্ঞানের অভাব ছিল না।

কেহ স্বীকার করুন আঁর নাই করুন, ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখিয়া সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় যে, কুলাচার ও দেশাচারের অবিরোধে শিক্ষাই সৎশিক্ষা, এবং যে সঙ্গ পাপব্যসনের দ্বারোদ্ঘাটন না করে, তাহাই সৎসঙ্গ।

আর্য্যজাতির তাবৎ শিক্ষা দীক্ষাই ধর্ম্মপ্রণোদিত; ধর্ম্ম কার্য্যের সহিত স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রবন্ধান্তরে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত করিবার বাসনা থাকিল। স্থূলতঃ এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রাচীন আর্য্যগণ প্রত্যেক ধর্ম্মকার্য্য স্বাস্থ্যের অনুকূলতা অতি দক্ষতার সহিত নিহিত করিয়া স্ব স্ব অপূর্ব্ব ধীমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা ফলোপধায়কতা সঙ্গোপিত করিয়া একান্ত কর্ত্তব্যতাকে বিবিধ অর্থবাদের সহিত এবং অকারণে প্রচুর প্রত্যবায় প্রদর্শনের সহিত ব্যবস্থিত করিয়া গিয়াছেন। তাহার কারণ সর্ব্বদুঃখাকর স্বকাম ধর্ম্মের প্রসর বৃদ্ধি না করিয়া নিখিল শর্ম্মাস্পদ নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু হায়! দেশ কাল পাত্র বশে তাহা আজ অবজ্ঞার আস্পদ ও অবহেলার বিষয়। অনেক ব্রীড়াবিহীন ব্যক্তি স্পষ্টাক্ষরেই

প্রাচীন প্রণালীর কুসংস্কারত্ব প্রতিপাদনে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু সেই কুসংস্কারাপন্ন প্রাচীনগণের সুখময় জীবনের সহিত স্বীয় ভীষণ দুঃখময় জীবনের যে কি তারতম্য, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। উন্নতি-পিপাসু হইলে যে স্বীয় দেশাচার ও কুলাচারকে উল্লঙ্ঘন করিতে হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। নানা অলঙ্কার ভূষিত বারাঙ্গনাকে দেখিয়া কুলাঙ্গনাগণের কুলটা হওয়া কি উচিত?

তাই বলিতেছিলাম, কৌলিক ধর্ম্মের অবিরোধে শিক্ষা দেওয়াই সংশিক্ষার সুব্যবস্থা। ব্যসনপরম্পরার অনিদান সুসঙ্গই সংসঙ্গ।

উন্নতির ইচ্ছুক হইয়া অগ্রসর হইতে নিবারণ করি না, তবে ধ্রুব বিষয়ে অনাস্থা করিয়া অধ্রুব বিষয়ে ধাবিত হওয়া বিজ্ঞোচিত কার্য্য নহে। পরিহিত বস্ত্রের শ্লথতাকে উপেক্ষা করিয়া উষ্ণীষ বন্ধনে ব্যগ্র হওয়া ব্রীড়াব্যঞ্জক নহে কি?

আমাদের বিশ্বাস, সংশিক্ষা ও সত্তের সমাদর এবং অসৎ ও ব্যসনপরম্পরার মূলোচ্ছেদ ব্যতীত অবনম্যমান ভূস্বামিবৃন্দের পুনরুত্থান অসম্ভব।

কেবল ভূস্বামিগণের নিমিত্ত ভীষণ ভবিতব্যতা বা কুগ্রহগণের কুদৃষ্টি সৃষ্টি হয় নাই। অন্তশ্চর ও অন্তিকচর মূর্ত্তিমান্ গ্রহগণের নিগ্রহ সাধন করুন। অচিরে ব্যোমচর গ্রহগণ অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন, সন্দেহ নাই।

পরিণীতা পত্নীর ন্যায় স্বাধিকৃতা পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণ

করুন ; বসুন্ধরা কল্পলতার ন্যায় অচিরে নিঃসংশয় অভীষ্ট ফল প্রসব করিবে। আর আমাদের অনুরোধ নিম্নলিখিত শ্লোকটীর প্রতি দয়া করিয়া দৃক্‌পাত করুন। নীতি শাস্ত্র বলেন ;—

"দুষ্টস্য দণ্ড সুজনস্য পূজা ন্যায়েন কোষস্য চ সংপ্রবৃদ্ধিঃ।
অপক্ষপাতোঽর্থিষু রাজ্যরক্ষা পঞ্চৈব যজ্ঞা কথিতা নৃপাণাম্॥"

কার্ত্তিকে মৎস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ কেন ?

হিন্দু-সমাজে কার্ত্তিক মাসে চিরদিন মৎস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ আছে। কেন নিষিদ্ধ, তাহা জানিনা। পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত বলিয়াই হউক, অথবা ইহার ভিতরে কোনও এক নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে বলিয়াই হউক, বংশপরম্পরায় এই প্রথা প্রতি-পালিত হইয়া আসিতেছে। কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবে একটা না একটা কারণ যে ইহার মূলে অবশ্যই বর্ত্তমান আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কারণটী যে অবশ্য একটী মহৎ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাহাও বোধ হয় সূক্ষ্মদর্শী শিক্ষিতের অস্বীকার্য্য হইবে না বা হইতে পারেনা। যাহা হউক, পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত বলিয়া অন্ধ-বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া অথবা মানসিক

দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন ইচ্ছা স্বত্বেও গবেষণা না করিয়া, আজ পর্য্যন্ত আমরা স্বর্গীয় মহাত্মাগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আসিতেছি; মনে কোন দ্বৈধভাব জাগে নাই।

গত কার্ত্তিক মাসে, জানিনা কি উদ্দেশ্যে, একজন শিক্ষিত হিন্দু হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিলেন—"কার্ত্তিকে মৎস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ কেন?"---তিনি নিত্য মৎস্যাশী হইতে পারেন বা নিরামিষ ভোজন তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইতে পারে, তাহা হইলেও তাঁহার এ প্রশ্ন উপহাসের যোগ্য নহে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পিতৃপিতামহাচরিত প্রথা সমর্থন করা অপেক্ষা গবেষণার সাহায্যে এই প্রশ্নের উত্তর করিতে প্রস্তুত হইলে, আশা করা যায় যে, প্রশ্নটী অনেক আবশ্যক বিষয়ের শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবে। অন্যের কথা বলিতে পারিনা, প্রশ্নটী অন্ততঃ আমার পক্ষে বড়ই স্পৃহণীয় হইয়াছে। প্রশ্নটী চিরপোষিত বংশপরম্পরায় প্রতি-পালিত, সেই অন্ধবিশ্বাস বা গবেষণা-ভাবরূপ পর্য্যঙ্কশায়িত ঘোর সুষুপ্তিগ্রস্থ চিত্তকে আজ উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সেই মূল নিহিত অমূল্য কারণানুসন্ধানে ব্যগ্র। এরূপ স্থলে কি করিয়া বলিব যে প্রশ্নটী উপেক্ষার বিষয়? উড়াইয়া দিবার যোগ্য?

প্রশ্নটী প্রথম শ্রবণকালে মনে একটুকু বিরক্তি আসিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণে মনোমধ্যে এক তুমুল আন্দোলন আসিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রশ্নের প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তি জন্মাইল। মনে হইল, ঈশ্বরের অংশাবতার পুরাণপ্রবর্ত্তক ব্যাসদেবের উক্তি—

যাহার ভিত্তি ভারতাকাশের এক এক উজ্জ্বলতর নক্ষত্র স্মৃতি-প্রবর্ত্তক মনু, অঙ্গিরা, শঙ্খ, শাতাতপ প্রভৃতি, যাহার ব্যবস্থাপক অদ্বৈতবাদী শঙ্করাবতার শঙ্কর; বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামাবতার রামানুজ; পবিত্র দ্বৈতবাদী কৃষ্ণাবতার চৈতন্যদেব ইত্যাদি মহাত্মাগণ যাঁহার অনুমোদক, হিন্দুগণের সংযমপ্রধান সেই বিধি নিষেধ ঘটিত ব্রতগুলি, পালি পার্ব্বণগুলি, যথেচ্ছাচার-প্রসূত বলিতে সাহস হয় কি? অথবা উন্মত্তের কপোলকল্পিত বলিতে প্রবৃত্তি হয় কি? অথবা ইহার মধ্যে এমন কোন নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রাখিয়া স্বীয় সদুদ্দেশ্যের সাফল্য সাধন করা হইতেছে, যাহা ইচ্ছা করিয়া কামনা-কলুষিতচিত্ত মানবকে জানিতে দেওয়া হইতেছে না। কর্ম্মীর নিকট সৎকর্ম্ম ব্রতাদি আদৃত হয় হউক; অদ্বৈতবাদী শঙ্কর ইহার মূলোৎপাটন করিয়া গেলেন না কেন? যুধিষ্ঠির, নহুষ, নল, দিলীপ প্রভৃতি সম্রাট্-গণই বা এই অর্থ-ব্যাঘাতকারী, সময়-অপব্যয়কারী ও শরীর-শোষণকারী ব্রত-নিচয়ে আস্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন কেন? কি ধর্ম্মী, কি কর্ম্মী, কি অর্থী, কি পরমার্থী সকলেই হিন্দুগণের সংযমপ্রধান ব্রত-নিচয়ের অনুমোদন করিয়াছেন ও করিতেছেন। এরূপ স্থলে সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় কি যে, ব্রতগুলির প্রবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণ হিন্দুজাতিকে প্রতারিত করিয়াছেন বা একটা যথেচ্ছাচার করিয়া গিয়াছেন? কার্ত্তিকমাহাত্ম্য আলোচনা করিলে দেখা যায় স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে;—কার্ত্তিকং খলু বৈ মাসঃ সর্ব্বমাসেষু চোত্তমং” অর্থাৎ সকল মাসের মধ্যে

নিশ্চয়ই কার্ত্তিক মাস উত্তম। পদ্মপুরাণে উক্ত আছে ;—
"দ্বাদশেষ্বপি মাসেষু কার্ত্তিকঃ কৃষ্ণবল্লভঃ," অর্থাৎ দ্বাদশ মাসের মধ্যে কার্ত্তিক মাস কৃষ্ণপ্রিয়।

দীপেনাপি হি যত্রাসৌ প্রীয়তে হরিরীশ্বরঃ।
সুগতিঞ্চ দদাত্যেব পরদীপপ্রবোধনাৎ ॥

অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে সামান্য প্রদীপ দ্বারা শ্রীহরি প্রীত হয়েন এবং পরের দীপকে উত্তেজিত করিলেও সুগতি প্রদান করেন।

প্রবৃত্তানাংচ ভক্ষ্যাণাং কার্ত্তিকে নিয়মে কৃতে।
অবশ্যং কৃষ্ণরূপত্বং প্রাপ্যতে মুক্তিদং শুভং ॥

অর্থাৎ—কার্ত্তিক মাসে নিত্য ভক্ষণীয় দ্রব্যের নিয়ম (অর্থাৎ সঙ্কোচ) করিলে, অবশ্য মুক্তিপ্রদ শুভ কৃষ্ণসারূপ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ন মৎস্যং ভক্ষয়েন্মাংসং ন কৌর্ম্ম্যং নান্যদেবহি,
চাণ্ডালো জায়তে রাজন্ কার্ত্তিকে মৎস্যভক্ষণাৎ,
বকোঽপি তত্র নাশ্নীয়ান্মৎস্যং চৈব কদাচন।

অর্থাৎ কার্ত্তিকে মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিলে চণ্ডাল হয় ; বক পর্য্যন্ত কার্ত্তিকে মৎস্য মাংস ভক্ষণ করেন না।

বোধ হয় বকপঞ্চক বলিয়া যে প্রবাদ বাক্য আছে, ইহাই তাহার মূলভিত্তি।

মনে করিলাম, প্রশ্নকর্ত্তাকে এই সমস্ত কার্ত্তিক-মাস-মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম,

প্রশ্নকর্ত্তা হিন্দুগণের আচার ব্যবহারে সম্প্রতি সন্দিগ্ধ। অধিকন্তু পিতৃ-পিতামহ প্রভৃতির পদাঙ্কানুসরণ করিতে পশ্চাৎপদ। সুতরাং তাঁহার নিকট অপ্রত্যক্ষ ব্যাস-বশিষ্ঠাদির নিগূঢ়-তত্ত্ব-সমবেত বিধি-নিষেধ-পূর্ণ স্মৃতি বাক্য উদাহৃত করিলে, অন্ধবিশ্বাস সপ্রমাণ করিবার অবসর দেওয়া হইবে ও বেদবাক্য অবজ্ঞাত হইবে। স্মৃতি ও পুরাণোক্ত ব্যবস্থাবলী জন্মান্তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। প্রশ্নকর্ত্তা জন্মান্তর স্বীকার করেন কি না, তাহা আমার অগোচর। পরন্তু প্রত্যক্ষবাদপ্রিয় প্রশ্নকর্ত্তার নিকটে ব্যাস-বশিষ্ঠাদির উচ্চাসন আশা করাও অসঙ্গত।

আমি বলিব স্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন, "মাস মধ্যে কার্ত্তিক মাস পুণ্যময়; তাহাতে ব্রত করিলে নন্দনন্দন কৃষ্ণচন্দ্র প্রীত হইয়া বিষ্ণুলোকে স্থান দান করেন।" হয়ত প্রশ্নকর্ত্তা ইহা শুনিয়া পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিয়া বসিবেন যে, 'নন্দটা কে? তাহার নন্দন কৃষ্ণচন্দ্রই বা কোথায়? তাহার পেশা কি? স্বর্গ কোথায়? স্বর্গ কি নন্দনন্দন কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারী যে, সে সেখানে জমি বাড়ী দিয়া রাখিবে?' ইত্যাদি অনর্গল প্রশ্ন চলিবে। এতাবৎ মূল প্রশ্ন (অর্থাৎ) "কার্ত্তিকে মৎস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ কেন?" ইহার উত্তর হয় নাই; তাহার উপর এতাদৃশ প্রশ্নপরম্পরা আসিয়া পড়িলে, আমাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বুদ্ধিবৃত্তিটী আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে, উত্তর দিব কি করিয়া? বিশেষতঃ আমাদের সে শিক্ষা নাই, সে সিদ্ধি নাই, সে সাধনা নাই, সে ভক্তি নাই, সে শ্রদ্ধা নাই, এক কথায় সে ভাগ্য

নাই যে, প্রহ্লাদের ন্যায় স্তম্ভ হইতে দীনবন্ধু কৃষ্ণচন্দ্রকে বাহির করিয়া দেখাইব। স্বর্গের নাম শুনিয়াছি, হিন্দুজাতি স্বর্গ সম্বন্ধে ও জন্মান্তর সম্বন্ধে যে অসন্দিগ্ধ তাহাও জানি; কিন্তু প্রত্যক্ষবাদপ্রিয় প্রশ্নকর্ত্তার তাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষগোচর করাইব কি প্রকারে? অন্ধবিশ্বাসে অবিশ্বাসী প্রশ্নকর্ত্তা সাক্ষাতে না দেখিলেত বিশ্বাস করিবেন না! পুনরায় মনে করিলাম, প্রশ্নকর্ত্তাকে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রশংসাবাদ অংশ পরিত্যাগ করিয়া ভয়সূচক নিষেধগর্ভবাক্যগুলি শুনাইব, অর্থাৎ বলিব যে, "মৎস্য ভুক্ নরকং ব্রজেৎ," কার্ত্তিকে মৎস্য ভক্ষণ করিলে নরক হয়। কিন্তু পরক্ষণেই পুনরায় ভাবিলাম, পূর্ব্ববৎ প্রশ্নপরম্পরা উঠিবে—নরক কোথায়? কোন্ জেলায়? ভারতবর্ষ হইতে কয় ঘণ্টার পথ? সুতরাং প্রশ্নকর্ত্তার রুচি অনুসারে উত্তর না করিলে গত্যন্তর নাই। সম্ভবতঃ প্রশ্নকর্ত্তা পরজন্মবিদ্বেষী; সুতরাং পরজন্ম পরিহার করিয়া উত্তর না করিলে পরিত্রাণ নাই। তাহা হইলে সম্প্রতি দেখা উচিত যে, ঐহিক সুখের সহিত কার্ত্তিক বিহিত ব্রতনিচয়ের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না? স্বাস্থ্যই ঐহিক সুখের একমাত্র সাধক। অতএব বিশেষভাবে দেখিব যে, কার্ত্তিক মাসে বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মাবলীর সহিত সেই স্বাস্থ্যের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না? বোধ হয়, ইহাতে কাহারও মতদ্বৈধ নাই যে, কি ধর্ম্মী, কি অর্থী, কি পরমার্থী সকলেই কোনও না কোনও একটা বিশেষ লক্ষ্যকে প্রাপ্তব্য মনে করিয়া অনবরত ব্যাপৃত। কর্ম্মী যে দুঃখকে দুঃখ না বলিয়া অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে প্রাণপণে কর্ম্ম-

পথে ধাবিত হইতেছে, তাহার যেমন আত্মপ্রসাদ বা সুখ স্পৃহণীয় বস্তু, ধর্ম্মী যে যম-নিয়ম-ধ্যান ও ধারণাদির দ্বারা দৃঢ় সংযত হইয়া ঐহিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছে, তাহারও সেই বিলক্ষণ আত্মপ্রসাদ বা সুখ স্পৃহণীয় সামগ্রী। অর্থীর নিকটেও সেই এবং পরমার্থীর নিকটেও তাই। এক কথায় আস্তিক নাস্তিক ও মধ্যবর্ত্তী (অর্থাৎ আস্তিকও নয় নাস্তিকও নয় কিম্ভূতকিমাকার যথেচ্ছাচারী একটী নব্য সম্প্রদায়, যাঁহারা দলে দলে সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন) সকলেরই সুখ সম্বন্ধে সেই এক কথা। রুচি অনুসারে সুখের তারতম্য থাকিলেও অথবা এক শ্রেণীর প্রার্থনীয় সুখবিষয়ে অপর শ্রেণীর আপত্তি থাকিলেও, সামান্যতঃ সুখ নামে একটী সর্ব্বজন-আদরণীয় বস্তু যে বর্ত্তমান, ইহা কাহারও অস্বীকার্য্য হইবে না। আমরা সেই সুখকে ঐহিক এবং পারত্রিক এই দুইভাগে বিভক্ত করি। আপাততঃ ঐহিক সুখকে পুনরায় শারীরিক ও মানসিক এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি। শরীর স্বচ্ছন্দভাবে আহার বিহার ও নিদ্রাদিতে সমর্থ হইয়া কর্ম্মক্ষম থাকিলে, তাহাকে শারীরিক সুখ বলিয়া জ্ঞাপন করি। অপুত্রকের পুত্রপ্রাপ্তি এবং নির্ধনের ধনপ্রাপ্তি ইত্যাদিতে যে আত্মপ্রসাদ জন্মে, তাহাকে মানসিক সুখ বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকি। সুখকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেও মনই সুখের জন্মভূমি ও শরীর তাহার রঙ্গভূমি। শরীরের সহিত মনের এত বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, শারীরিক সুখ ব্যতিরেকে মানসিক সুখ প্রকাশ পাইতে পারেনা, এবং মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য না

থাকিলে, শারীরিক সুখের সত্তাও উপলব্ধ হয় না; আহার বিহার ও নিদ্রা সমস্ত লয় প্রাপ্ত হয়। একজন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও শারীরিক স্বাস্থ্য নাই বলিয়া, তাঁহার পক্ষে তাঁহার জীবনটী যেমন দুর্ভর, অসাধারণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়াও কোন এক অভীপ্সিত বস্তুর অলাভে যাহার মন অশান্তিতে পরিপূর্ণ, তাঁহার পক্ষে তাহার জীবনও সেইরূপ দুর্ভর। তবে সর্ব্ববিধ মানসিক সুখসম্বন্ধে সকলের ঐকমত্য হওয়া সর্ব্বথা দুর্ঘট। একের মন হয়ত একজন দীন দরিদ্রকে এক মুঠা অন্ন দিয়া পরম সুখী, কিন্তু অন্যের চিত্ত তাহাতে বিষম বিরক্ত। একজন হয়ত শাকান্নে সন্তুষ্ট, অপরে হয়ত পলান্নেও সন্তুষ্ট নয়। অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই, প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নই তাহার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্তস্থল। হিন্দুগণ কার্ত্তিক মাসে মৎস্য পরিত্যাগ করিয়া সুখী, তাহাতে তাহাদের চিত্ত প্রসন্ন, কিন্তু অনেকে আবার কার্ত্তিক-সুলভ (ক্ষেত্রজ প্রোষ্ঠী) বিলের পুঁটি মাছ উদরসাৎ করিয়া পরম আনন্দিত। তাহাতে তাঁহাদের মনের বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি। তাহা হইলে এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, মানসিক সুখকে ভিত্তি করিয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে বসিলে, আমরা সকলের সহিত একমত হইতে পারিব না। শারীরিক সুখ বা স্বাচ্ছন্দ্য এস্থলে ধর্ত্তব্য। শরীর সুস্থ থাকিলে শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য; আর শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকিলে সর্ব্ববাদি-সম্মত সর্ব্বশ্রেণীর স্পৃহণীয় সে সুখ যে দুর্লভ নয়, বোধ হয় প্রশ্নকর্ত্তা ইহা অঙ্গীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। প্রশ্নের

উত্তর হউক অথবা না হউক, সদুত্তর হইলেও তাহা প্রশ্নকর্ত্তার অনুমোদিত হউক অথবা নাই হউক, আমরা আয়ুর্ব্বেদোক্ত দ্রব্য-গুণ-বিচারের সাহায্যে দেখিতে চেষ্টা করিব যে, কার্ত্তিক মাস-বিহিত স্মৃতিপ্রসিদ্ধ কার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি স্বাস্থ্যের অনুকূল কি না এবং নিষিদ্ধ কার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি স্বাস্থ্যের প্রতিকূল কি না ?

বায়ুপুরাণের মতানুসারে স্মৃতি বলেন,—

যদীচ্ছেদ্বিপুলান্ ভোগান্ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহোপমান্
কার্ত্তিকং সকলং ব্যাপ্য প্রাতঃস্নায়ী ভবেন্নরঃ।
দিনে দিনেচ স্নাতব্যং শীতলাসু নদীষু চ।

অর্থাৎ—চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ তুল্য বিপুল ভোগ লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিলে, সমস্ত কার্ত্তিক মাস প্রত্যহ শীতল নদী জলে প্রাতঃস্নান কর্ত্তব্য।

গরুড় পুরাণের মতানুসার স্মৃতি বলেন—

গবামযুতদানেন যৎফলং লভতে খগ।
তুলসীপত্রকৈকেন তৎফলং কর্ত্তিকে স্মৃতং।

অর্থাৎ—অযুত গোদান করিলে যে ফললাভ হয়, কার্ত্তিক মাসে বিষ্ণু দামোদরের উদ্দেশ্যে একটী মাত্র তুলসীপত্র প্রদান করিলে সেই ফল হইয়া থাকে।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মতানুসার স্মৃতি বলেন—

বিষ্ণুবেশ্মনি যো দদ্যাৎ কার্ত্তিকে মাসি দীপকং।
অগ্নিষ্টোমসহস্রস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥

অর্থাৎ—কার্ত্তিক মাসে বিষ্ণু-মন্দিরে যে ব্যক্তি ঘৃতাদিপূর্ণ প্রদীপ প্রদান করে, সে ব্যক্তি অগ্নিষ্টোম সহস্রের ফল প্রাপ্ত হয়। অধিক কি 'পরদীপ প্রবোধনাৎ' নিজে প্রদান করিতে অসমর্থ হইলেও পর-প্রদত্ত প্রদীপ উস্কাইয়া দিলেও পুণ্য আছে বলিয়াছেন। এই প্রদীপ প্রদান সম্বন্ধে স্মৃতি ভূরি ভূরি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। স্মৃতির এই ব্যবস্থা দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, স্মৃতির অভিপ্রায় কার্ত্তিক মাসে সর্ব্বথা ঘৃতাদিপূর্ণ দীপাদি ব্যবহৃত হউক। বলা বাহুল্য কার্ত্তিক মাস-বিহিত ভারতের প্রায় সার্ব্বভৌম বা সার্ব্বজনীন দীপাবলী অমাবস্যা, মহালয়া-শ্রাদ্ধ-বিহিত উজ্জ্বল আলোক দান এবং সমস্ত মাসব্যাপী হিন্দুর প্রত্যেক গৃহে আকাশ প্রদীপ দান, সে ভারতময় প্রাচীন প্রথার ধ্বংসাবশেষ।

ইহা ব্যতীত কার্ত্তিকে অন্যান্য অবান্তরীন কৃত্যকলাপ অনেক থাকিলেও প্রাতঃস্নান, ব্রহ্মচর্য্য, তুলসী দান ও প্রদীপ প্রদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল হবিষ্যান্ন ভোজন ও যম নিয়ম ব্রতোপবাসের আলোচনা করিব। স্মৃতির স্থূলতঃ অভিমত—

প্রবৃত্তানাঞ্চ ভক্ষ্যাণাং কার্ত্তিকে নিয়মে কৃতে।
অবশ্যং কৃষ্ণরূপত্বং প্রাপ্যতে মুক্তিদং শুভং॥

অর্থাৎ কার্ত্তিকে নিত্য ভক্ষ্যমান দ্রব্যের নিয়ম সঙ্কোচ করিলে, মুক্তিপ্রদ শুভ কৃষ্ণপদ প্রাপ্ত হয়।

বলা বাহুল্য এই প্রথা বা আদেশই হবিষ্যান্নের ভিত্তি।

হবিষ্যান্নে বিহিতকাল ও বিহিত কতিপয় মাত্র দ্রব্যের ব্যবস্থা থাকায়, তন্নিবন্ধন আহারের সঙ্কোচ অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইলেও বিহিত দ্রব্যগুলির নামোল্লেখ করিয়া একবার আয়ুর্ব্বেদ সাহায্যে সেগুলির গুণাগুণ আলোচনা করিয়া দেখা সঙ্গত মনে করি।

হবিষ্য দ্রব্যানি।

স্মৃতি বলেন—

'হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গাস্তিলা যবাঃ' এই শ্লোকার্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া 'অতৈলপক্বং মুনয়ো হবিষ্যান্নং বিদুর্ব্বুধাঃ' এই পর্য্যন্ত ৪টী শ্লোকে হবিষ্যান্নের দ্রব্যগুলি নির্ব্বাচিত হইয়াছে। শ্লোকগুলি বাহুল্য ভয়ে না তুলিয়া দ্রব্যগুলি ভাষায় ব্যক্ত করিতেছি। হৈমন্তিক অন্ন, (চিনি সংস্পৃক্ত খাদ্য,) মুগ, নারিকেল, তিল, যব, নীবার (উড়িধান,) বেথোশাক, হিংচে শাক, ক্ষুদ্র মূলা, সৈন্ধব লবণ, গোদুগ্ধ ও গব্যঘৃত, পনস, আম্র, আমলকী, হরীতকী, জীরক, পিপ্পলী, কদলী, ইক্ষু ও অতৈলপক্ক দ্রব্য ইহাই হবিষ্যান্নে ব্যবহার্য্য। অধিকন্তু বলা হইয়াছে,—

'তুলসীং বিনা যা ক্রিয়তে ন পূজা,
স্নানং ন তদ্ যৎ তুলসীবিবর্জ্জিতং,
পীতং ন তদ্ যৎ তুলসীবিবর্জ্জিতং,

অর্থাৎ—তুলসী বিনা স্নান পূজা দান পান সব নিষ্ফল।

প্রত্যেক কার্য্য তুলসী সাহচর্য্যে করিতে হইবে ও প্রত্যেক দ্রব্য এমন কি ফলটী পর্য্যন্ত তুলসী-সংপৃক্ত করিয়া আহার করিতে হইবে। সর্ব্বকর্ম্মে তুলসীর প্রাশস্ত্য কীর্ত্তিত হইতেছে। ফল কথা কার্ত্তিক মাসে তুলসীর বহুল ব্যবহারই স্মৃতিকারের অভিমত। স্মৃতি আরও বলেন,—

'গীতং বাদ্যংচ নৃত্যংচ কার্ত্তিকে পুরতো হরেঃ।
যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা লভতে চাক্ষয়ং ফলং ॥

অর্থাৎ—কার্ত্তিকে শ্রীহরির সম্মুখে যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত গীত বাদ্য ও নৃত্য করে, সে অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হয়। বলা বাহুল্য কার্ত্তিকে রাসোৎসব, প্রত্যহ দেবালয়ে নাম সংকীর্ত্তন ও দৈনিক দ্বারে দ্বারে বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক বিষ্ণুনাম কীর্ত্তন, এই ব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও অনাদি কাল আচরিত। সম্প্রতি জানা যাইতেছে যে, স্মৃতির মতে কার্ত্তিক মাসে প্রাতঃস্নান, ব্রহ্মচর্য্য, তুলসীর বহুল ব্যবহার, ঘৃতময় প্রদীপ ব্যবহার ও নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি হবিষ্যোপযোগী দ্রব্যের ব্যবহার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদোক্ত রোগানুৎপাদনীয়াধ্যায়-বিহিত ঋতুচর্য্যা ও দিনচর্য্যা অবলম্বন করিয়া, এই কার্ত্তিক মাসে আয়ুর্ব্বেদ কি কি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা দেখিবার চেষ্টা করিব। ঋতুচর্য্যার আলোচনায় আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন,—

মাসৈর্দ্বিসংখ্যৈর্মাঘাদ্যৈঃ ক্রমাৎ ষড়ৃতবঃ স্মৃতাঃ।
শিশিরোঽথ বসন্তশ্চ গ্রীষ্মবর্ষাশরদ্ধিমাঃ ॥

অর্থাৎ—মাঘাদি দুই দুই মাসে এক একটী ঋতু গণনা করিয়া যথাক্রমে শিশির বসন্তাদি ছয়টী ঋতু হইয়া থাকে। যথা—মাঘ ফাল্গুন শিশির, চৈত্র বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন কার্ত্তিক শরৎ, অগ্রহায়ণ পৌষ হেমন্ত।

শীতে বর্ষাসু চাদ্যাং স্ত্রীন্ বসন্তেঽন্ত্যান্ রসান্ ভজেৎ।
স্বাদুং নিদাঘে শরদি স্বাদুতিক্তকষায়কান্।

অর্থাৎ—শীতল বর্ষাকালে মধুর অম্ল ও লবণ রস, বসন্তকালে কটু তিক্ত ও কষায় রস, গ্রীষ্মকালে মধুর রস এবং শরৎকালে মধুর তিক্ত ও কষায় রস সেবন করিবে। তাহা হইলে আমাদের আলোচ্য কার্ত্তিক মাসটী শরৎকাল মধ্যে গৃহীত হইতেছে। শরৎ-চর্য্যা আলোচনা করিলে দেখা যায়,—

বর্ষাশীতোচিতাঙ্গানাং সহসৈবার্করশ্মিভিঃ।
তপ্তানাং সঞ্চিতং পিত্তং বৃষ্টৌ শরদি কুপ্যতি।
তজ্জয়ায় ঘৃতং তিক্তং বিরেকো রক্তমোক্ষণং।

অর্থাৎ—বর্ষাশৈত্যাভ্যস্ত ব্যক্তিদিগের শরীর শরৎকালে হঠাৎ সূর্য্য কিরণের দ্বারা তাপিত হইলে, বর্ষাসঞ্চিত পিত্ত শরতে প্রকুপিত হয়। অতএব পিত্ত প্রশমনার্থ তৎকালে শাস্ত্রবিহিত ঘৃত ও তিক্ত সেবন করা উচিত। এবং বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য। আবার শরৎকালে খাদ্যাখাদ্য নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে—

তিক্তং স্বাদু কষায়ঞ্চ ক্ষুধিতোঽন্নং ভজেল্লঘু।
শালিমুদ্গাসিতা ধাত্রী পটোলং মধু জাঙ্গলং।
চন্দনোশীরকর্পূরমুক্তাস্রগ্ বসনোজ্জ্বলঃ।
সৌধেষু সৌধধবলাং চন্দ্রিকাং রজনীমুখে।

অর্থাৎ—শরৎ ঋতুতে ক্ষুধার উদ্রেক বোধ করিলে, তিক্ত মধুর ও কষায় রসযুক্ত লঘু অন্ন (পুরাতন চাউলের অন্ন) মুগ, চিনি, আমলকী, পটোল, মধু ও জাঙ্গল মাংস ভোজন করা উচিত। চন্দন ও উশীরানুলেপন, কর্পূর ও মুক্তা-সংশ্লিষ্ট মাল্য-ধারণ এবং শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক শুচি হইয়া সৌধোপরি সৌধধবলা চন্দ্রিকা সেবন করা বিধেয়।

অধিকন্তু শরৎ-চর্য্যায় বলা হইয়াছে যে—

তপ্তং তপ্তাংশুকিরণৈঃ শীতং শীতাংশুরশ্মিভিঃ
সমন্তাদপ্যহোরাত্রমগস্ত্যোদয়নির্ব্বিষং।
শুচি হংসোদকং নাম নির্ম্মলং মলজিজ্জলং
নাভিষ্যন্দি ন বা রুক্ষং পানাদিষ্বমৃতোপমং।

অর্থাৎ—যে জল সমস্ত দিন সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সন্তপ্ত এবং সমস্ত রাত্রি চন্দ্র ও নক্ষত্রাদিকিরণে সুশীতল ও অগস্ত্যোদয়ে নির্ব্বিষীকৃত, আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্রকারগণ তাহাকে হংসোদক বলেন। এই পবিত্র নির্ম্মল জল বাতাদি দোষনাশক ও অনভিষ্যন্দি অর্থাৎ কফকারক নহে বা রুক্ষ নহে। স্নান পানাদিতে ইহা অমৃততুল্য।

শরৎকাল ব্যতীত অগস্তির উদয় হয় না, এবং সেই অগ-স্তির রাত্রি শেষ প্রাশস্ত্য কীর্ত্তিত থাকায় আয়ুর্ব্বেদ শরৎকালে

প্রাতঃস্নানের ব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রদান করিতেছেন। দিনচর্য্যা আলোচনা সময়ে বলা হইয়াছে যে, 'সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বদা প্রাতরুত্থান ও প্রাতঃস্নান বিধেয়'। ঋতুচর্য্যা আলোচনায় জানা যাইতেছে শরৎকালে সর্ব্বথা প্রাতঃস্নান বিধেয়। কেবল প্রাতঃস্নান বলি কেন, শরৎকালে পিত্তপ্রশমনার্থ তাবৎ কৃত্যই করা উচিত। শরৎকালে প্রাতঃকালীন নদীর জল, যাহা হংসোদক নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহা কফকারক নহে, অথচ পিত্ত-নাশক। সুতরাং শরতে পিত্তপ্রশমনার্থ নদীতে প্রাতঃস্নান করা একান্ত উচিত। আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্রকার ও স্মৃতিকার প্রাতঃস্নান সম্বন্ধে যে একমত, তাহা সুস্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে। দুইজনেই জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী সন্দেহ নাই। একজন ঐহিক স্বাস্থ্যের কথা কহিতেছেন, অপরে পারত্রিক পুণ্যের কথা বলিতেছেন। হিন্দুজাতি ইহকাল পরকাল উভয়ই স্বীকার করিয়া থাকে; সুতরাং হিন্দুর নিকট স্বাস্থ্যও যেমন আদরের জিনিষ, পারত্রিক পুণ্যও সেইরূপ স্পৃহণীয় বস্তু। শুনিয়াছি বড় বড় ডাক্তারগণও প্রাতঃস্নানের ব্যবস্থা দিতে কুণ্ঠিত হন না। তাহাদের মধ্যে অনেকে প্রাতঃস্নান করিয়া থাকেন। তবে তাঁহাদের মত প্রাতঃস্নান করিয়া অনাবৃত অঙ্গে থাকা উচিত নয়, গরম কাপড় পরিধান ও গরম ঘর ব্যবহার করা উচিত। হিন্দুজাতি প্রাতঃস্নানান্তে শুচি ও শুদ্ধ রেশমী অথবা পশমী কাপড় পরিধান করিয়া, সোত্তরীয় হইয়া দেবমন্দিরে প্রবিষ্ট হন; এবং তুলসী চন্দন উশীর কর্পূর ইত্যাদি সদ্গন্ধবিশিষ্ট মনঃপ্রসাদকর সামগ্রী

লইয়া দেবার্চ্চনায় রত হয়েন। উভয়ের আচরিত প্রথাগুলি স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল হইলেও এক শ্রেণী কেবল স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া মানবগণকে সকামভাবে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, অন্য শ্রেণী পারত্রিক পুণ্যের প্রয়োজনীয়তা খ্যাপন করিয়া মানবদিগকে নিষ্কামভাবে চালিত করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদ ঐহিক সুখের একমাত্র সাধক, স্বাস্থ্যের অনুকূলে কেবল ব্যবস্থা দিতেছেন। সুচতুর স্মৃতিকার স্বাস্থ্যের অবিরোধে পারত্রিক পুণ্যের একমাত্র সাধক ধর্ম্মকার্য্যের উপদেশ প্রদান করিতেছেন। স্মৃতিকারের একাক্রিয়া দ্ব্যর্থকরী হইতেছে। এক্ষণে সুধীগণ বিবেচনা করুন, এই উভয়ের মধ্যে কাহার ব্যবস্থা কি প্রকার কৌশলপরিপূর্ণ ও সম্মানার্হ। বালককে কবচ ধারণ করাইয়া যিনি যুগপৎ শরীরের শোভা সংবর্দ্ধন ও অরিষ্ট নাশ করিতে যত্ন করেন, তাঁহার সে ব্যবস্থা যে গভীর গবেষণাপ্রসূত ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কামনা আংশিক অপূর্ত্তিতে বিষময় ফল প্রসব করে। কর্ত্তব্যজ্ঞানের নিকট অভাবে ঔদাসীন্য নাই বা সদ্ভাবে উন্মত্ততা নাই। কর্ত্তব্যজ্ঞানে দায়িত্ব আছে কামনায় দায়িত্ব নাই। সুধীগণ বিবেচনা করুন, ইহার মধ্যে কাহার মূল্য অধিক। যাহা হউক প্রাতঃস্নান সম্বন্ধে কি আয়ুর্ব্বেদ কি স্মৃতি উভয়ের মত যে এক ইহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বোক্ত ঋতুচর্য্যানুসারে আশ্বিন কার্ত্তিক এই দুই মাস শরৎ। শরতে বর্ষাসঞ্চিত পিত্ত প্রকুপিত হয়। তজ্জন্য শরতে পিত্তপ্রশমনার্থ তাবৎ আহার বিহার করা উচিত। এস্থলে

সন্দেহ হইতে পারে যখন শরতের মধ্যে আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই দুই মাস পরিগৃহীত হইতেছে, তখন কেবল কার্ত্তিক মাস পুণ্য বা পিত্তপ্রধান কাল হইবে কেন? আশ্বিন বা হইবে না কেন? অথবা কার্ত্তিকে কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য প্রথাগুলি আশ্বিনে আচরিত না হইবে কেন? আশঙ্কা মন্দ নয়। আশ্বিনে শরৎ-কালোচিত অনেক ব্যবস্থা আচরিত হইলেও কার্ত্তিকে যে বিশে-ষত্ব রহিয়াছে, তাহা কিঞ্চিন্মাত্র প্রণিধান করিলে জানা যায়। কার্ত্তিক শরতের অন্তিম মাস, সুতরাং ঋতুর সন্ধিস্থল; অব্য-বহিতপরবর্ত্তী হেমন্তকালের সহিত ইহার সন্ধি। সন্ধিকালে সন্ধিপূজার ন্যায় সতর্ক রহিবার জন্য আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ দিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ কেন, সর্ব্বসাধারণে কার্ত্তিক মাসটীকে যে যমের অধিকার বিস্তারের কাল বলিয়া থাকেন এবং সাবধানে রহিবার চেষ্টা করেন, বোধ হয় ইহাতে অনেকের সহিত আমি একমত হইতে পারিব। আর ঋতু-সন্ধি বলিয়া হউক অথবা ইহা বর্ষাসিক্ত পৃথিবীর পূতিগন্ধসম্পৃক্ত কলেবরের শোষণকাল, সুতরাং দূষিত বাষ্পরাশি প্রচণ্ড সূর্য্য-কিরণের দ্বারা উর্দ্ধে উত্তোলিত হইয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয় বলিয়াই হউক, কর্ত্তিক যে ম্যালেরিয়া বা জীর্ণজ্বরের লীলাক্ষেত্র এবং নবাবির্ভূত মহামারী অর্থাৎ প্লেগের অবির্ভাব কাল, বোধ হয় ইহা শিক্ষিত অশিক্ষিত সাধারণ অল্লাধিক জানেন। আয়ুর্ব্বেদমতে এই সমস্ত ঋতু-সন্ধি-কালে পরভাবী ঋতু প্রতিপালনীয় অনেকগুলি নিয়ম প্রতি-পালন করিবার উপদেশ রহিয়াছে। হেমন্তে অসাবধান হইলে

অর্থাৎ শরীরে ঠাণ্ডা লাগাইলে হঠাৎ সর্দ্দি, কাশি, কফ ও বাত (নিউমোনিয়া) পর্য্যন্ত হইতে পারে, ইহা অনেকের অনুভূত। সুতরাং আশ্বিনের ন্যায় কার্ত্তিকে কেবল পিত্তনাশক আহার ও বিহার স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। কফ-পিত্তনাশক অথবা ত্রিদোষ-নাশক আহার ও ব্যবহার অনুকূল।

যে মৎস্য কথা লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে, এক্ষণে তাহার গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া দেখিবার আবশ্যক যে, স্বাস্থ্যান্বেষীর পক্ষে তাহা ভোজনের অনুকূল কি না ?

মৎস্যাস্তু বৃংহণাঃ সর্ব্বে গুরবঃ শুক্রবর্দ্ধনাঃ,
বল্যাঃ স্নিগ্ধোষ্ণমধুরাঃ কফপিত্তকরাঃ স্মৃতাঃ।

অর্থৎ—সাধারণতঃ মৎস্য সকল মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পুষ্টিকর, রক্তপিত্তকারক ও কফপিত্তজনক।

পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদ ও স্মৃতি উভয়ের মতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, কার্ত্তিকে লঘু অর্থাৎ যাহা সহজে জীর্ণ হইতে পারে তাহাই সেবন করিবে, পিত্তনাশক দ্রব্য ব্যবহার করিবে এবং আহারের সঙ্কোচ করিবে। বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসটী শরৎ ও হেমন্তের সন্ধি বলিয়া কফপিত্তনাশক দ্রব্য আহার ও ব্যবহার করা সর্ব্বথা বিধেয়। এরূপ অবস্থায় কফ-পিত্তকারক, রক্তপিত্তজনক ও গুরুপাক মৎস্য ভক্ষণের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া স্মৃতিকার অপরাধ করিয়াছেন ইহা চিন্তা করা সঙ্গত নহে। আয়ুর্ব্বেদ স্বাস্থ্যহানির ভয় দেখাইয়া যাহা নিষেধ করিতেছেন, স্মৃতি, পুণ্যহানি ও নরকের ভয় দেখা-

ইয়া সেই নিষেধের সমর্থ করিতেছেন কি না সুধীগণ তাহা বিবেচনা করুন। বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাস—সুলভ ক্ষেত্রজ প্রোষ্ঠী (বিলের পুঁঠি মাছ) মৎস্যের মধ্যে কিরূপ গরিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যনাশক তাহা সাধারণের অবিদিত নাই। মূর্ত্তিমান পিত্ত-স্বরূপিণী পুঁঠি মাছ যে ম্যালেরিয়া দেবীর জীবন্ত আমন্ত্রণ পত্রিকা বোধ হয় অনেকেই ইহাতে সহাস্য অঙ্গীকার প্রদান করিবেন। সেই পুঁঠি সস্তার দিনে এবং সাধারণতঃ কার্ত্তিক মাসে 'মৎস্য ভক্ষণ নিষেধের আদেশ' দিয়া, স্মৃতি ভিতরে ভিতরে আয়ুর্ব্বেদের অমোঘ উপদেশ হিন্দুজাতির শিরায় শিরায় যে প্রবাহিত করিয়া দেন নাই ইহা কে বলিতে পারে? ইহাতে অঙ্গীকার দিবার কুণ্ঠা প্রকাশ করিলে দগ্ধোদরের বশীকরণকে উচ্চাসন দেওয়া হইবে না কি?

আয়ুর্ব্বেদ আরও বলেন—শরতে—

তুষারক্ষারসৌহিত্য-দধিতৈলবসাঽতপান্,
তীক্ষ্ণমদ্যদিবাস্বপ্ন-পুরোবাতান্ পরিত্যজেৎ।

অর্থাৎ—নীহার, ক্ষার, উদরপূর্ণ ভোজন, দধি, তৈল, বসা (চর্ব্বি) বিশিষ্ট জিনিষ, সূর্য্যাতপ, তীক্ষ্ণ মদ্য, দিবা নিদ্রা, ও পূর্ব্ব বায়ু পরিত্যাগ করিবে। তাহা হইলে তৈলিক পাচা, অন্যথা দূষ্য, চর্ব্বীব্যাপ্ত এবং পূর্ণভোজনের সম্পূর্ণ সহায় সেই মৎস্য তাঁহার মতে শরতে একান্ত পরিত্যজ্য কি না, তাহা বিজ্ঞমণ্ডলী বিবেচনা করুন। কেবল মৎস্য ভক্ষণ নিষেধ বলিয়া নয়, স্মৃতি-মৃতানুসারে কার্ত্তিক মাসবিহিত হবিষ্যান্নোপযোগী

পদার্থগুলির নিম্নে একটী তালিকা প্রদান করিয়া আয়ুর্ব্বেদের সহিত স্মৃতির যে কিরূপ দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহা দেখাইতে যত্ন করিলাম।

স্মৃতিবিহিত হবিষ্যান্ন দ্রব্য।	আয়ুর্ব্বেদবিহিত তত্তৎ দ্রব্যের গুণ।

১। হৈমন্তিকধান্য—শীতল ও পিত্তনাশক।
২। চিনিমিশ্রিত খাদ্য—মধুর ও পিত্তনাশক।
৩। মুগ—মধুর ও কফ পিত্তনাশক।
৪। নারিকেল—বাতপিত্তনাশক।
৫। তিল—কষায় রস শরতে সেব্য।
৬। যব—মধুর রস ও কফপিত্তনাশক।
৭। নীবার—মধুর রস পিত্তনাশক ও লঘুপাক।
৮। বেথোশাক—মধুর রস ও ত্রিদোষনাশক।
৯। হিংচেশাক—তিক্তরস ও পিত্তনাশক।
১০। ক্ষুদ্র মূলা—কটুরস, ত্রিদোষনাশক ও লঘুপাক।
১১। সৈন্ধবলবণ—পাচক ও ত্রিদোষনাশক।
১২। গো-দুগ্ধ—মধুর রস ও পিত্তনাশক।
১৩। গব্যঘৃত—ত্রিদোষনাশক।
১৪। পনস—মধুর রস ও বাতপিত্তনাশক।
১৫। আম্র—মধুর রস ও ত্রিদোষনাশক।
১৬। জীরক—লঘু ও পাচক।

স্মৃতিবিহিত হবিষ্যান্ন দ্রব্য।	আয়ুর্ব্বেদবিহিত তত্তৎ দ্রব্যের গুণ।
১৭। আমলকী	ইহার গুণ সকলেই জানেন।
১৮। হরীতকী	
১৯। পিপ্পলী	

২০। কদলী—বাতপিত্তনাশক।

২১। ইক্ষু—মধুর রস পিত্তনাশক।

২২। অতৈলপক্ব দ্রব্য—কারণ তৈলপক্বদ্রব্য পিত্তকারক ও দুর্জ্জর।

পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, শরৎকালে মধুর, তিক্ত ও কষায় রস সেবনীয়। ঋতু-সন্ধি বলিয়া শরতের অন্তর্গত হইলেও কার্ত্তিক মাসে কফপিত্তনাশক বা ত্রিদোষনাশক খাদ্য ব্যবহার্য্য। উদ্ধৃত তালিকা দৃষ্টে আপনারা বিবেচনা করুন যে পুণ্যান্বেষী স্মার্ত্তদিগের সহিত স্বাস্থ্যান্বেষী আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্রকারদিগের আভ্যন্তরীণ মতে কিরূপ দুশ্ছেদ্য ঐক্য বর্ত্তমান। এরূপ স্থলে বিবেচনা করুন অধিকারিভেদ ও রুচিভেদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যবস্থাপকদ্বয় জগতের হিতৈষণায় কোনরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন কি না? পূর্ব্বে আর এক কথা বলা হইয়াছে যে, স্মৃতিকারের উপদেশ, প্রত্যেক খাদ্য দ্রব্য তুলসীসম্পৃক্ত করিয়া ভক্ষণ করিতে হইবে। তুলসী যে ম্যালেরিয়ানাশক ইহা আমেরিকান ডাক্তারগণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকেন। সামান্যতঃ অস্মদ্দেশীয় চিকিৎসকগণ যে তুলসী রসে

জ্বরঘ্ন ঔষধগুলি প্রয়োগ করিয়া থাকেন তাহা অনেকে বিলক্ষণ অবগত আছেন। কি করিয়া বলিব যে ম্যালেরিয়ার লীলাক্ষেত্র কার্ত্তিক মাসে সেই তুলসীর ভূরি ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিয়া স্মৃতি-কার প্রকারান্তরে স্বাস্থ্যের অনুকূলে ব্যবস্থা দিয়া যান নাই ?

আর একটী বিষয় বোধ হয় পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, স্মৃতি শরৎকালবিহিত পূজা ও ব্রতগুলি গব্যঘৃত সংস্পর্শে পবিত্র করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ঘৃত যে ত্রিদোষনাশক এবং আজ্য ধূম যে বিবিধ সংক্রামক ব্যাধির বীজাণুনাশক ইহা সাধারণের স্বীকার্য্য। শরতে সেই ঘৃতপ্রচুর পূজা ও ব্রতগুলির ভূরি ব্যবস্থা করিয়া স্মৃতি যে স্বাস্থ্যের আনু-কূল্য করিয়া যান নাই ইহাও বলা সঙ্গত নহে। শরতে সর্ব্ব প্রধান শারদীয়া পূজা, কালী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা ও কার্ত্তিক পূজা ইত্যাদি অন্যান্য অনেক ব্রত ও পূজা যাহাতে ঘৃত-প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তৎসমস্ত এই শরতে— অধিকন্তু কার্ত্তিকে ব্যবস্থিত হইয়াছে দেখিয়া অনুমান হয় যে, শরৎকালে অধিকন্তু ঋতুসন্ধি কার্ত্তিক মাসে ঘৃতের বহুল ব্যবহার স্মৃতির একান্ত অভিপ্রেত। এতগুলি ঘৃতপ্রচুর পূজা ও ব্যবস্থা করিয়া স্মৃতিকার পর্য্যাপ্ত মনে করেন নাই। সর্ব্বশেষে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সৃষ্টি করিয়া যমভীতি নিবারণার্থ ভগিনীদত্ত পর্য্যাপ্ত ঘৃতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দেবমন্দিরে ঘৃত প্রদীপ, শূন্যমার্গে ঘৃত প্রদীপ, জলমধ্যে ঘৃত প্রদীপ, গৃহের আঙ্গিনায় ঘৃত প্রদীপ— অধিক কি শয়নগৃহে পর্য্যন্ত ঘৃত প্রদীপের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কে বলিতে পারে,

দীপাবলি অমাবস্যা, পিতৃগণের উদ্দেশ্যে উজ্জ্বল প্রদীপ প্রদান ও প্রাত্যহিক প্রত্যেক গৃহে কার্ত্তিকমাসব্যাপী আকাশ প্রদীপের ব্যবস্থা করিয়া, বর্ষাসিক্ত পৃথিবীর পূতিগন্ধসংস্পৃক্ত কলেবরের শোষণকালে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণের দ্বারা-উর্দ্ধোত্তোলিত দূষিত বাষ্প-রাশির সংশোধন করা স্মৃতিকারগণের ইচ্ছার বিষয়ীভূত হইয়াছিল না ? এই পর্য্যন্ত ব্যবস্থা দিয়াই স্মৃতি ক্ষান্ত হন নাই। অশ্ব-পঞ্চমীতে অশ্বশালায় ঘৃতাহুতি গজষষ্ঠীর দিনে হস্তীশালায় ঘৃতাহুতি এবং রাখীপূর্ণিমায় গোশালায় ঘৃতাহুতি ও বন্দাপনাদির ব্যবস্থা করিয়া যে স্মৃতি আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থানগুলির পরিষ্করণ ও সংশোধন করা উদ্দেশ্যের বিষয়ীভূত করিয়া যান নাই, ইহা কে বলিতে পারে ?

উপসংহারে কার্ত্তিকমাস বিহিত আহারসঙ্কোচের কথা কিছু বলিব। কার্ত্তিকে যে আহার সঙ্কোচ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য ইহা স্মৃতি পরোক্ষভাবে বলিয়া থাকিলেও একজন পণ্ডিত আশীর্ব্বাদকালে মহারাজকে কিরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে বোধ হয় শিক্ষিত সাধারণ কৌশলক্রমে স্বাস্থ্য সাধক দ্রব্যগুলি সম্বন্ধে প্রকারান্তরে উপদেশ দিতেন।

পৌষে মাসি নিরাহারা বহ্বাহারাশ্চ কার্ত্তিকে
চৈত্রে মাসি গুড়াহারা ভবন্তু তব শত্রবঃ।

অর্থাৎ—হে মহারাজ ! আপনার শত্রুগণ পৌষমাসে নিরা-হার, কার্ত্তিকমাসে বহ্বাহার ও চৈত্রমাসে গুড়াহার করুক। বাক্যটী আশীর্ব্বাদাত্মক। মহারাজকে উদ্দেশ করিয়া আশীর্ব্বাদ

করা হইয়াছে। যে কয়েকটী বিশেষণ দ্বারা রাজার শত্রুকে বিশেষিত করা হইয়াছে, সেই বিশেষণের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব কিরূপভাবে নিহিত রহিয়াছে দেখুন। পৌষমাসে নিরাহার হইলে রোগ, কার্ত্তিকমাসে বহ্বাহার হইলে রোগ এবং কফপ্রধান বসন্তকাল চৈত্রমাসে গুড় খাইলে কফজনিত রোগ অবশ্যম্ভাবী।

আপনারা বিবেচনা করুন কার্ত্তিকে প্রচুর পরিমাণে আহার করিলে যে অনিষ্ট হয়, তাহা পূর্ব্বে কিরূপ সার্ব্বজনীন ছিল। যাহা হউক আমাদের বিশ্বাস হিন্দুগণ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূজা-পার্ব্বণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া এবং স্বেচ্ছা-চার-স্রোতে ভাসমান হইয়া ভারতকে যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর রঙ্গভূমি করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের সহিত আমি একমত হইতে পারিব। সর্ব্বশেষে নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য প্রদেশের মুকুটমণিস্বরূপ জর্ম্মান দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লুইস্ কুণ্ সাহেবের আংশিক মত উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধের সমাপন করিলাম।

The new science of Healing নামক পুস্তকে Louis Kuhne বলিতেছেন—"...in a number of families children have been reared from the begining without meat, and I have always made a special point of watching the development of such ; I can confidently assert, that the trials have resulted decidedly in favour of a vegetarian diet. The children's develop-

ment is almost without exception admirable both phisically and mentally in all three directions—that of the understanding, the will and the temper.

ইহার ভাবার্থ এই যে, কোন কোন পরিবারের সন্তানগণ প্রথমাবস্থা হইতে মাংস আহার করে না। আমি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহাতে তাহারা হৃষ্টপুষ্ট হইয়া থাকে। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে নির্দ্ধারণ করিতেছি যে, এই পরীক্ষা নিরামিষ ভোজনের ফল। এতদ্দ্বারা বালকগণ শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ উত্তম ফললাভ করে। তাহারা ত্রিবিধ মানসিক ফল প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বুদ্ধিগত, ইচ্ছাগত ও প্রকৃতিগত।

শ্বেতাঙ্গ ব্যবস্থাপক অপেক্ষা ভারতীয় কৃষ্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপকগণ একটু অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। আয়ুর্ব্বেদ একেবারে নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা দেন নাই। দেশ বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ ও অবস্থা বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই শরৎকালেও জাঙ্গল মাংস ভোজনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই মাংস ভোজন ব্যবস্থাতেও স্বাস্থ্যরক্ষার অচিন্তনীয় কৌশল নিহিত রহিয়াছে, অনুসন্ধিৎসা সহকারে অবহিত হইলে তাহা জানা যায়। জাঙ্গল মাংসের মধ্যে হরিণ ও শশক এই দুই মাংস ভক্ষ্য কোটীতে পরিগৃহীত হয়। অনুসন্ধিৎসুগণ আয়ুর্ব্বেদ-সাহায্যে বিলক্ষণ জানিতে পারিবেন যে, উক্ত দুই মাংস ত্রিদোষনাশক ও অনেক রোগাপহ। ভক্ষ্য মাংসের অভাব ছিল না, কিন্তু কালবিশেষে ও অবস্থাবিশেষে এই মাংসের বিশেষ বিশেষ নির্ব্বাচন দেখিয়া

যাঁহারা পূর্ব্বাচার্য্যগণের অলৌকিকী প্রতিভা—অচিন্তনীয় চিন্তা-শীলতা ও কৌশলপূর্ণ হিতৈষণায় শ্রদ্ধা ও আস্থার পরিবর্ত্তে অবজ্ঞা ও অনাস্থা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের নিকট আমরা প্রদত্ত উত্তরের সারবত্তা আশা না করিলেও এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, পারত্রিক পুণ্যের প্রবর্ত্তক স্মৃতিবাক্যে আস্থা রাখিলে স্বাস্থ্যলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল হইবে না।

ঈতি।

অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টির্মূষিকাঃ শলভা খগা,
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতা ঈতয়ঃ স্মৃতঃ।

দুর্ভিক্ষ পত্নী ঈতি আমাদের চির পরিচিত। ইহা ছয় ভাগে বিভক্ত। ১ম অতিবৃষ্টি, ২য় অনাবৃষ্টি, ৩য় মূষিক, ৪র্থ শলভ, ৫ম খগ, ৬ষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবৃন্দের প্রত্যাসত্তি অর্থাৎ সীমান্তে সমুপস্থিতি। পুরাকালে ঈতি ছিলনা এরূপ নহে কিন্তু সম্প্রতি ভারতে যুগপৎ সবকয়টীর আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্যই সকলে জানেন, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি পরস্পর প্রতিযোগী, উভয়ের এককালীন আবির্ভাব অসম্ভব, কিন্তু ভারতের কি দৌর্ভাগ্য, বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বিপজ্জাল ভারতের নিষ্পেষণে স্ব স্ব প্রতিযোগিত্ব পরিহার করিয়া সামানাধিকরণ্যে

শত্রুতা করিতেছে। এইখানে মহাকবি কালিদাসের একটী কবিতা মনে আইসে, কবিকুল-তিলক বলিয়াছেন—

জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ, ত্যাগে শ্লাঘা বিপর্য্যয়ঃ
গুণা গুণানু বন্ধিত্বাৎ তস্য সপ্রসবা ইব।

জ্ঞান ও মৌন, ক্ষমা ও শক্তি এবং ত্যাগ ও শ্লাঘাভাব এই কয়েকটী পরস্পর বিরুদ্ধগুণ। গুণের অনুরোধে দীলিপ মহারাজার নিকট সপ্রসব অর্থাৎ ভ্রাতৃভাবে বিরাজিত ছিল। দৌর্ভাগ্যের অনুরোধে আমাদের ভারতেও বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বিনী-ঈতি সন্ততি, সহোদরার ন্যায় একত্র সমাবিষ্টা। ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য বহু দিনের ঘটনাবলী উদ্ঘাটিত করিতে হইবে না। বর্ত্তমান বৎসরই তাহার সাক্ষ্য দিবে। গত আষাঢ়ে যখন হৈমন্তিক ধান্যোৎপাদনের প্রধান সময় এবং পকোন্মুখ আশু ধান্যের প্রচুর জলাপেক্ষা সেই সময়েই দেবী অনাবৃষ্টির আগমনে তৎসমস্তই ভস্মীভূত হইয়া গেল। আশু ধান্য ত একেবারেই গেল, যথাকথঞ্চিৎরূপে জীবিত থাকিয়া হৈমন্তিক ধান্য যদিও শ্রাবণের বারিধারায় পুনঃ কৃষি জীবীর আশার সহিত পল্লবিত হইয়াছিল, দেবী অতিবৃষ্টি এই আশ্বিনের ভীষণ জল প্লাবনে তাহা একেবারে কবলিত করিলেন। এক বৎসরেই ভগিনীদ্বয়ের উপদ্রব ভারতের কিরূপ সর্ব্বনাশ করিল দেখিয়া লউন। এইত গেল অতি বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির কথা। ৩য় মূষিক, প্রতিক্ষেত্রে প্রতিবাসে প্রতিদিন যে ঈতিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে তাহা লিখাই বাহুল্য। ৪র্থ শলভের বৃত্তান্ত উপসংহারে

বিশদরূপে বলিবার বাসনা রহিল। ৫ম খগ, বঙ্গদেশে শস্যাদিতে খগের উপদ্রব খুব কম হইলেও উৎকলে তাহা মূর্ত্তিমান। চক্রবাক ও তজ্জাতীয় এক রকম পক্ষী প্রতিবৎসরেই হেমন্তের প্রাদুর্ভাবে গভীর ধান্য ক্ষেত্র সমুদায়ে পড়ে। তাহাদের প্রত্যেকটী প্রায় প্রত্যহ ৩।৪ সের সুপক্ক শালিধান্য উদরস্থ করিয়া কৃষি জীবীর সর্ব্বনাশ করে। ৬ষ্ঠ, ঈতির কথা অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। যে দিন হইতে প্রতিযোগী রুস ভারতের সীমান্তে পদার্পণ করিয়াছেন, তদ্দিনাবধি ভারত যে কিরূপ আছে তাহা শিক্ষিত মাত্রেই সুবিদিত। ষড়বিধ ঈতি মধ্যে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভ, মূষিক, খগ ও প্রত্যাসন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা একত্র সমাবিষ্ট হইয়া ভারতকে যে কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে তাহা প্রতিপন্ন হইল। সম্প্রতি শলভের বৃত্তান্তে প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

অধুনা ইহা মেদিনীপুর, চাইবাসা, খুরদা ও গঞ্জাম প্রভৃতি কয়েকটী জেলাকে অনিবার্য্য অত্যাচারে উৎসন্ন করিতে বসিয়াছে। ইহাই এখন সবকয়েকটী ঈতি অপেক্ষা গরীয়সী। বিগত ১২৯৫ সালে একবার শলভ দেখা গিয়াছিল; তাহারা প্রায় বেলা ৫টার সময় নৈঋত কোণে আবির্ভূত হইয়া (শোনা যায়) তৎপর দিন রূপনারায়ণের জলে অধিকাংশ প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়। তাহারা যে ক্ষেত্রে ও যে বৃক্ষে বসিয়া গিয়াছিল সেই ক্ষেত্র ও বৃক্ষের প্রচুর ক্ষতি হইলেও কিছু দিন পরে তাহা পুনরায় যথাবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু উপস্থিত শলভ তাহা হইতে সম্পূর্ণ

নূতন। ইহারা অজর, অমর, অক্ষয় ও অব্যয়। ইহাদের অত্যাচার অসীম। ১৩০৬ সালে প্রথমে চাইবাসা জেলার অধিকাংশ স্থানে আবির্ভূত হয়, তৎপরে ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। আমরা পূর্ব্বে জানিতাম এ জীব বড়জোর উভচর হইতে পারে; কিন্তু এ সর্ব্বনেশে শলভ ত্রিচর। ইহারা স্বচ্ছন্দে আকাশে যেরূপ উৎপতিত হইতে পারে তদ্রূপ ভূমিতেও ইহাদের অব্যাহত গতি, অধিকন্তু ইহারা জলমগ্ন হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে বিলক্ষণ পটু। প্রথম আষাঢ়েই ইহাদের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছানা দেখিতে পাওয়া যায়। ধান্যের বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ ইহারাও পরিবর্দ্ধিত হয়। ধান্য প্রসবোন্মুখ হইবার সময়ে দেখা যায় উহাদের মুখ তীক্ষ্ণ করাত সদৃশ হইয়াছে। তদ্দারা ধান্যের থোড় কাটিয়া কৃষিজীবিগণের বহু আয়াস সাধ্য প্রাণসম শস্যের সর্ব্বনাশ সাধন করে। ধান্য কর্ত্তন সময়ে উহারা উপর্য্যুপরি সংযোজিত হইয়া উড্ডীয়ন শক্তি রহিত হয়। অনেকেই বলেন ইহাই তাহাদের ঋতুকাল। এই মার্গশীর্ষ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাসের মধ্যেই কোন এক সময় আলির গর্ত্তে ও ফাটালের মধ্যে মধ্যে সর্ষপ হইতেও ক্ষুদ্রতর বহু সংখ্যক ডিম্ব প্রসব করে। অনেকেই বলেন, না হইলেও এক একটা শলভ দ্ তিন সহস্র ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। এই ডিম্ব চণ্ড রশ্মির প্রচণ্ড রশ্মিতে ভস্মীভূত হয়না, অথবা ভীষণ জলপ্লাবনে নষ্ট হইবার নহে। পুনরায় ধান্য বপনের পর যেই ধান্যাঙ্কুর দেখিতে পাওয়া যায় অমনি অসংখ্য শলভ-শিশুও আবির্ভূত

হইয়া ধান্য গাছের সহিত পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এইরূপে আজ চারি বৎসর কাল দেশকে জর্জ্জরিত করিয়া ছাড়িতেছে। পূর্ব্বে লোকে যে ক্ষেত্রে দশ পনর মণের অধিক ধান্য পাইত, পাপ শলভের উপদ্রবাবধি সেই ক্ষেত্রে দু তিন মণের অধিক পায়না। ইহাতেই বিবেচনা করিয়া লউন এক সামান্য শলভেই সংসারের কি শোচনীয় অবস্থা ঘটাইতেছে। জগৎ পিতা জগদীশ্বর আর্ত্তনাদপূর্ণ দেশের মাঙ্গল্য বিধান করিয়া এ শোচনীয় দৃশ্যের কবে যে যবনিকা পতন করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারায় অনেকেই উৎকন্ঠিত।

অপূর্ব্ব অতিথি সৎকার।

"দানং বিত্তাদৃতং বাচঃ কীর্ত্তিধর্ম্মৌ তথায়ুষঃ।
পরোপকরণং কায়াদসারাৎ সারমাহরেৎ॥"

বাক্য হ'তে সত্য আর বিত্ত হ'তে দান
আয়ু হ'তে কীর্ত্তি ধর্ম্ম করিবে আদান।
শরীর হইতে আর পর-উপকার
এ'রূপে সংগ্রহ কর অসারের সার॥

পূর্ব্বকালে ময়ূরধ্বজ নামক এক অতি ধর্ম্মভীরু হরিভক্ত রাজা ছিলেন। একদা ভগবানের অপার কৃপায় তাঁহার সখিত্ব লাভ করিয়া অর্জ্জুনের মনে "আমিই অধিক ভক্ত" এইরূপ

কিঞ্চিৎ অভিমানের সঞ্চার হওয়ায় সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ তাহা বুঝিতে পারিয়া কৌশলে একজনের গর্ব্ব-খর্ব্ব করতঃ সৎপথে আনয়ন এবং অপর একজনের মহত্ত্ব-প্রকটন-মানসে অর্জ্জুনকে বলিলেন—"সখে! শুনিতেছি রাজা ময়ূরধ্বজ অতিশয় হরি-ভক্ত ও ধর্ম্মভীরু। চল একবার ছদ্মবেশে গমন করতঃ রাজার হরিভক্তি ও ধর্ম্মভীরুতা প্রত্যক্ষ করিয়া আসি।" অর্জ্জুনও অন্তর্যামীর অন্তরের কথা বুঝিতে না পারিয়া "তাহাই হউক" বলিয়া সম্মতি প্রদান করায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে একটি সুন্দর বালকের বেশে সাজাইয়া এবং স্বয়ং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দৌবারিক দ্রুতপদে রাজাকে "দ্বারে অতিথি উপস্থিতির" বার্ত্তা প্রদান করিল। রাজা তখন কৃষ্ণসেবায় অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন; সুতরাং দৌবারিককে বলিলেন—"তুমি তাঁহাদিগকে কিয়ৎক্ষণের জন্য দ্বারে সম্মানের সহিত উপবিষ্ট করাও, আমি অবিলম্বে যাই-তেছি।" অতিথিদ্বয় দৌবারিকের নিকট এই রাজাজ্ঞা অবগত হইয়া ছল করিয়া কিঞ্চিৎ ক্রোধের ভাণ করতঃ "তবে রাজা অতিথির উপেক্ষা করিলেন" এই বলিয়া রাজদ্বার পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থানোদ্যোগ করিতেছেন ইত্যবসরে রাজা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণের চরণযুগল ধারণ করিয়া কাতর-স্বরে স্বীয় দোষের ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ আতিথ্য স্বীকার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ মিথ্যা কোপ প্রদর্শন করতঃ বলিলেন "যদি আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ করি-

বার প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে তোমার দোষ ক্ষমা করিতে পারি এবং তোমার দ্বারে অতিথিও হইতে পারি, নতুবা নহে।” রাজা ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া বলিলেন—“আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য যদি আমাকে রাজ্য, ধন, জন, পুত্র, কলত্র অথবা অধিক কি যদি জীবনও পরিত্যাগ করিতে হয় তাহাতেও আমি কাতর নহি। আপনি প্রসন্ন হউন, দোষ ক্ষমা করুন, আতিথ্য স্বীকার করুন।” ব্রাহ্মণ রাজার এই বিনয়-মধুর ব্যবহারে এবং ক্ষত্রিয়োচিত প্রতিজ্ঞাবাক্যে আনন্দিত হইয়া বলিলেন, “সন্তুষ্ট হইলাম, দোষ ক্ষমা করিলাম, আতিথ্য স্বীকার করিলাম।” পরে রাজা আনন্দিত হইয়া যথাবিধি সৎকার করতঃ আসনে উপবিষ্ট করাইলেন। কিয়ৎক্ষণ শান্তিলাভের পর রাজা করযোড়ে বলিলেন “এ দাসকে তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া অনুদ্বিগ্ন করুন।” ব্রাহ্মণ রাজার এই বিনয়-নম্র বাক্যে প্রীত হইয়া বলিলেন—“রাজন্! তোমার ব্যবহারে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। ব্যবহার কুলোচিতই হইয়াছে। প্রিয়ংবদ! প্রার্থনা আর কিছুই নহে—যখন আমি তোমার রাজধানীতে আসিতেছিলাম সেই সময়ে পথে বনমধ্যে দৈববশতঃ এক সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হয়। সিংহ আমার সঙ্গী এই বালকটিকে উদরসাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তখন আমি অনন্যোপায় হইয়া সবিনয়ে কাতরস্বরে সিংহকে বলিলাম “পশুরাজ! ক্ষান্ত হও ক্ষমা কর! ইহা তোমার রাজোচিত কার্য্য নহে।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দুঃখ দিয়া কি ফল হইবে ? দয়া করিয়া এই বালকটির জীবনদান কর। অন্য যাহা কিছু খাইতে ইচ্ছা কর তাহাই আনিয়া দিব ইহাকে পরিত্যাগ কর।" সিংহ আমার ঈদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণে দয়া করিয়া বলিল "যদি তুমি এই রাজ্যের রাজার অর্দ্ধাঙ্গ আনিয়া দিতে পার তাহা হইলে আমি এই বালককে পরিত্যাগ করিতে পারি।" আমি তাহাই হইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করায় সিংহ বালকটিকে পরিত্যাগ করিয়াছে। অতএব সম্প্রতি আমাকে অকাতরে অর্দ্ধাঙ্গ প্রদান করতঃ আপনাকে ও আমাকে প্রতিজ্ঞা হইতে উদ্ধার করিয়া অক্ষয় যশঃ ও ধর্ম্ম লাভ কর।"

রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন —"অহো !

'পরোপকারায় বহন্তি নদ্যঃ পরোপকারায় দুহন্তি গাবঃ।
পরোপকারায় ফলন্তি বৃক্ষাঃ পরোপকারায় শরীরমেতৎ ॥'"

অদ্য আমার সুপ্রভাত। অদ্য হউক, কল্য হউক এ শরীরের পতন অবশ্যম্ভাবী। পতনের পর ইহা ভস্ম অথবা কৃমিকীটে যে পরিণত হইবে ইহাও নিশ্চিত। অতএব ঈদৃশ অকিঞ্চিৎ-কর দেহ দানে যদি পরোপকার রূপ পবিত্র পুণ্যসঞ্চয় হয়, তাহা হইলে এতদপেক্ষা অধিক সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে ? আপনি মনে কোন সন্দেহ করিবেন না। এই সমস্ত দেহ আপনাকে দান করিলাম। এখন আপনি ইহার যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন।" ব্রাহ্মণ রাজার ধৈর্য্য পরীক্ষার জন্য আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন। বলিলেন "হে ধর্ম্মবীর ! তোমার

এই দেহ যে ইদানীং আমার হইয়াছে, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু আরও একটি কথা আছে নির্দ্দয় সিংহ আসিবার কালে আরও বলিয়াছে যে 'রাজার দেহ আপনি অথবা অন্য কেহ ছেদন করিলে হইবে না। রাজমহিষী ও যুবরাজ উভয়ে করপত্র যোগে যদি কর্ত্তন করিয়া দেন তাহা হইলেই আমার ভোগ্য হইবে। অন্যথা এই বালকই আমার ভোগ্য স্থির জানিবেন।'" রাজা ইহা শ্রবণ করতঃ "তথাস্তু" বলিয়া মহিষী ও যুবরাজকে ডাকাইয়া তাঁহাদের নিকট প্রতিজ্ঞার কথা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিয়া বলিলেন "যদি আমি তোমাদের প্রিয় হই, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হেতু আমার ইহলোকে অযশঃ ও অন্তে নরকবাস যদি তোমাদের অভিপ্রেত না হয়; তাহা হইলে তোমরা ব্রাহ্মণের আদেশমত অকাতরে করপত্র গ্রহণ করিয়া আমাকে ছেদন করতঃ প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে উদ্ধার করিয়া নরক ও অযশঃ হইতে পরিত্রাণ কর।" পিতার অনুরূপ পুত্র, পতির অনুরূপ পত্নী। সুতরাং উভয়েই রাজবাক্য অনুমোদন করতঃ সহর্ষে রাজার মস্তকে করপত্র চালন করিতে আরম্ভ করিলেন। নাসিকা পর্য্যন্ত কর্ত্তিত হইয়াছে ইত্যবসরে রাজার বামচক্ষু হইতে হঠাৎ অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "দুর্ম্মতে! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া সামান্য দেহদানে কাতর হইলে? আমার এ দেহে প্রয়োজন নাই আমি চলিলাম তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ফল ভোগ কর।" তখন রাজা সবিনয়ে বলিলেন "দ্বিজবর! এ দাস নশ্বর তুচ্ছ দেহ

দানে অণুমাত্র কাতর নহে। তবে 'দক্ষিণাঙ্গ পরোপকারে ব্যয়িত হইবে আর আমি ভস্ম বা কৃমিকীটে পরিণত হইব' ইহাই ভাবিয়া বামাঙ্গ ক্রন্দন করিতেছে। দ্বিজবর! দয়া করিয়া ইহারও সদ্গতি বিধান করুন।" ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণরূপী হরি রাজার এই অকপট কথা শ্রবণ করতঃ অতিশয় আনন্দিত হইয়া নিজ প্রকৃত রূপ প্রকাশিত করিলেন এবং বলিলেন "যুবরাজ! বিরত হও। রাজন্! আমি তোমার ভক্তি ও ধার্ম্মিকতা পরীক্ষা করিবার জন্য এই ছল করিয়াছিলাম। আজ তুমি আমার এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিলাম। প্রিয়তম! অদ্য তোমার তপস্যা সফল হইল। যাও জীবনের অবশিষ্ট কয়েকদিন সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ অন্তে বৈকুণ্ঠ লাভ কর।" ভগবানের সুধামধুর বাক্যে ও সংদর্শনে রাজার শরীর ও মন অতিশয় সুস্থ হইয়া উঠিল; শরীর পূর্ব্ববৎ হইল। রাজা, রাণী ও রাজপুত্র হৃদয়ের আরাধ্যধন কৃষ্ণচন্দ্রকে সম্মুখে পাইয়া মনোমত পূজা করিয়া চরিতার্থ হইলেন। এবং বলিলেন "দয়াময়! যদি আমার প্রতি দয়া করিয়া থাকেন তাহা হইলে দয়া করিয়া আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে। কৃপাময় ঈদৃশ কঠোর পরীক্ষা যেন আর কাহারও প্রতি করা না হয়।" ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র "তথাস্তু" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। অর্জ্জুন রাজার এই অদৃষ্ট অশ্রুতচর অলৌকিক ভক্তি দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তাঁহার অভিমান অঙ্কুরেই বিলীন হইল। এবং

আপনাকে তৃণাদপি হেয় বলিয়া প্রতীতি হইতে লাগিল। ভগবান্ এইরূপে কৌশলে দুই কার্য্য সাধন করতঃ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ভাষানুবাদ।

সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষানুবাদ দ্বারা সাধারণের উপকার কি অপকার হইতেছে, উপস্থিত প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ভাষানুবাদ দ্বারা আমাদের প্রভূত উপকার সংসাধিত হইতেছে, কেহ কেহ বলেন যে, ভাষানুবাদ দ্বারা আপাততঃ উপকার প্রতীয়মান হইলেও ভিতরে ভিতরে অবনতির পথই পরিস্কৃত হইতেছে, সুতরাং ইহা উপকার নহে, উপকারাভাস মাত্র। কোন বিষয়ের তত্ত্ব নিষ্কাশনে প্রয়াসী হইলে, প্রথমতঃ উভয় পক্ষের কথার তারতম্য বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। অতএব দেখা যাউক ভাষানুবাদপ্রিয়গণ ভাষানুবাদের আধিক্য প্রদর্শনার্থ কীদৃশ যুক্তিনিবহের অবতারণা করেন এবং তৎপ্রতিপক্ষগণ তৎপ্রতিকূলেই বা কি বলিয়া স্বমত সংস্থাপন করেন। যাঁহারা ভাষানুবাদের প্রশংসা করেন, তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব্বকালে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গুরুকুলক্লিষ্ট হইয়া এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও জনসাধারণ যে যে গ্রন্থ সমূহের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইতেন না, ভাষানুবাদের

সাহায্যে আজ তাহা হস্তামলকের ন্যায় সম্মুখে অবভাসমান হইতেছে। পুরাণাদির আলোচনা করিলে অবগত হওয়া যায়, অনেক সময়ে অনেক বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া, ঋষিগণ অনাহারে অনিদ্রায় অনন্যচিন্তায় অতি দীর্ঘকাল তপস্যা করিতেন বটে, অবশেষে স্বীয় ভূত ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে কষ্ট দেওয়াই শেষ ফল দাঁড়াইত। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বের কিছুই মীমাংসা হইত না। আজ কালও হইতে ছিল না। ভাষানুবাদ রূপ নব বিভাকর যে দিন হইতে বিজ্ঞান রূপ ময়ূখমালায় আমাদের জন্ম জন্মান্তরীণ আন্তরিক গাঢ় অন্ধকারকে দূরাপসৃত করিয়াছে, সেই দিন হইতে জগৎ যে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ইহা কে না বলিবে? আরও পূর্ব্বে যিনি কোন এক গ্রন্থের কোন একটী তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিতেন, তিনি তাহা প্রাণাপেক্ষা প্রিয় করিয়া এবং ধনাপেক্ষা নিভৃত স্থানে রাখিয়া জনসাধারণের নিকট যাহা একটা মিথ্যা আড়ম্বর দেখাইতেন বা জনসাধারণকে তজ্জন্য যাহা দ্বারা উৎকণ্ঠিত করিতেন, ভাষানুবাদের সাহায্যে সেই স্বার্থপর আত্মম্ভরি ব্যক্তিনিচয়ের সেই বৃথা গর্ব্ব ও মিথ্যা আড়ম্বর একেবারেই চূর্ণ হইয়াছে। এবং তত্ত্বপিপাসু ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণকেও অনর্থক উৎকণ্ঠার অধীনতা স্বীকার করিতে হইতেছে না। আরও সুবিধা দেখুন, ইতঃপূর্ব্বে যদিও কেহ কেহ কথঞ্চিৎ কিছু কিছু শাস্ত্র মর্ম্ম সংগ্রহ করিতে পারিতেন, কালক্রমে একবার যদি তাহা বিস্মৃতিরূপ গভীর গুহায় বিসর্জ্জিত হইত, তাহা হইলে, তাহা আর প্রায়ই মিলিত না। যদিও কথঞ্চিৎ কিছু উদ্ধৃত

হইত, তাহা আবার সন্দেহ-পাংশু-বিজড়িত হইয়া বিভিন্নাকারে পরিণত হইত। ভাষানুবাদ আজ আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সেই শাস্ত্রীয় তত্ত্বগুলিকে বিস্মৃতি পিশাচীর করাল কবল হইতে চির রক্ষা করিতেছে। যখন যে বিষয়ের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইতেছে, তখন তত্তৎ বিষয় স্মৃতিপথে উদিত না হইলেও লবমাত্র কায়িক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ভাষানুবাদ পূত শাস্ত্র গ্রন্থ খুলিয়া দেখিলে অনায়াসে তত্তৎস্থল অবভাষিত হইতেছে ও অভূতপূর্ব্ব আনন্দ জন্মাইতেছে। তজ্জন্য লবমাত্র মানসিক পরিশ্রম বা ইতরের তোষামোদের আদৌ আবশ্যকতা হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে ভাষানুবাদের হিতকর আবির্ভাবে শাস্ত্রীয় সারনিচয় তাম্রফলক-খোদিত বর্ণাবলীর ন্যায় অক্ষুণ্ণভাবে প্রতি গৃহে সংরক্ষিত হইল। আরও ভাবিয়া দেখুন, ভাষানুবাদ হইবার পূর্ব্বে অধিকাংশ সংস্কৃত গ্রন্থের নামই অবিদিত ছিল। যদিও স্থানে স্থানে কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের অধ্যয়ন অধ্যাপনাচলিত, তাহা সার্ব্বভৌম বা সার্ব্বজনীন নহে। ভাষানুবাদ আমাদের সে শোচনীয় অভাব আজ দূর করিয়াছে। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য একটী কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই সংস্কৃত শাস্ত্রের অল্পাধিক ভাবে আলোচনা করিতে উৎসাহিত হইতেছেন। এবং সংস্কৃত গ্রন্থ যে কি জিনিষ ও পূর্ব্বকালীন আর্য্যগণের যে কীদৃশী প্রতিভা ভাষানুবাদই তাহা জগৎকে জানাইয়া দিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বে এই ভারত ছিল এবং এই ভগবদ্গীতাও ছিল, কিন্তু উপস্থিত সময়ের ন্যায়

শ্রীভগবদ্গীতার ঈদৃশ সমধিক সমাদর দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন কি ? আজ ভাষানুবাদের প্রসাদেই আমাদের অমূল্য রত্ন আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের অনন্যসার সেই "গীতা" প্রতিগৃহে বিরাজিত। পূর্ব্বে সংস্কৃত গ্রন্থের নাম শুনিলেই মনে যেন কি একটা ভয় আসিয়া অন্তঃকরণকে পশ্চাৎপদ করিয়া তুলিত। ভাষানুবাদরূপ পরিষ্কৃত পথের পথিক হইতে পারিয়া অন্তঃকরণ আজ সে ভয়ে ভীত নহে। ভাষানুবাদকে সহচর করিয়া শাস্ত্র-বারিধির গভীরতম প্রদেশ হইতেও সার রত্ন সংগ্রহে সাহসী হইয়াছে। ভাষানুবাদ রূপ রজঃ সংঘর্ষণে চিত্তদর্পণের অজ্ঞান কালিমা আর নাই। এইরূপে ভাষানুবাদের কয়টী প্রশংসার কথা বলিব ? জোর করিয়া বলিতে পারি জগৎ যদি তত্ত্বপিপাসু হইয়া থাকে তবে এই ভাষানুবাদেই। জগৎ যদি উন্নত হইয়া থাকে, তাহা ভাষানুবাদের অনন্য পরিণাম মাত্র। কি কায়িক, কি বাচিক, কি মানসিক সমস্ত উন্নতির ভাষানুবাদই অঙ্কুর।

পাঠক ! ভাষানুবাদ-প্রিয়গণের ভাষানুবাদ-প্রশস্তি শুনিলেন, প্রতিকূলবাদিগণ কি বলেন শুনুন। ভাষানুবাদদ্বেষীগণ বলেন, ভাষানুবাদ সম্বন্ধে যে কয়েকটি প্রশংসার কথা বলা হইয়াছে, সব কয়টীই ভ্রান্তের প্রলাপ বা অপরিণামদর্শিতার অনন্য ফল। আর্য্যগণের মতে তাহাই অনিন্দিত ও আশ্রয়নীয় যাহা বলবৎ অনিষ্টের অননুবন্ধী হইয়া ইষ্ট ফল প্রদান করে। অর্থাৎ যাহার আপাতমধুর ভাবে বিমুগ্ধ হইলে পরিণামে ভয়ঙ্কর অনিষ্টের আশঙ্কা অনিবার্য্য তাদৃশ কার্য্য পরিত্যাগ করা

উচিৎ। যেমন শ্যেন-যাগ আপাততঃ শত্রুমারণরূপ ইষ্ট ফল প্রদান করিতে সমর্থ হইলেও পরিণামে প্রাণিহিংসারূপ অনিষ্টের অনুবন্ধী বলিয়া, তাহা প্রশস্ত বা শিষ্টগণের আচরণীয় নহে। সহজ কথায় পাণ্ডুরোগী তাৎকালিক সুখপ্রদ অম্লরস সেবন করিতে একান্ত ইচ্ছুক হইলেও তাহার প্রতি তিন্তিড়্যাদি ব্যবস্থা কি বিধেয়? কখনই নহে। তদ্রূপ ভাষানুবাদ আপাততঃ উপকারের আভাস মাত্র দর্শাইয়া উন্নতিমার্গকে কণ্টকাকীর্ণ করিতেছে ও ভয়ানক অনিষ্টের সূত্রপাত করিতেছে বলিয়া একান্ত পরিত্যজ্য। পূর্ব্বে প্রথা ছিল উপনয়নান্তর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করতঃ যাবৎ দ্বাদশ বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন করিবে, এবং গুরুর নিদেশে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দার গ্রহণ করতঃ গৃহস্থ হইবে। যাঁহারা ভাষানুবাদের দ্বারা কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন, বেদাজ্ঞা প্রতিপালন করাত দূরের কথা তাঁহারা ঈদৃশ নিদেশ নিচয়ে অশ্রদ্ধা করিতে দোষ দেখাইতে—অসভ্যতা প্রতিপাদন করিতে খুবই উৎসাহিত হন। একে ত বেদাজ্ঞার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করাই মহাপাপ। অধিকন্তু যথেচ্ছাচারী হইয়া ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিতে অনুমাত্র ভীত নহেন। যে হেতু শ্রীমদ্‌ভগবৎ গীতায় ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন,—

যো শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিং॥

মহানুভব ঋষিগণ কর্ত্তৃক যাহা পূর্ব্বে মীমাংসিত হয় নাই,

আজ শত সহস্র যত্নেও যে তাহা অণুমাত্র মীমাংসার পথে আরূঢ় হইবে ইহা ভাবাই ভ্রান্তি। তবে যাহা কিছু সম্প্রতি পরিষ্কৃত বা নূতন বলিয়া প্রতীতি গোচর হয়, তাহা আর্য্য শাস্ত্রের আমূল আলোচনার অভাব মাত্র। এখনও আমাদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে, যে সমস্ত সারনিচয় দৃষ্টি-পথে আইসে, তাহার শতাংশের একাংশও আধুনিক কেহই আবিষ্কৃত করিতে পারেন নাই বা পারিবেন না। ইহা একান্ত সত্য যে, যাহা ছিল না, তাহা আজও নাই; যাহা নাই, ভবিষ্যতেও তাহা হইবে না। স্বয়ং ভগবান স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।"

মনে করিবেন না যে, আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে। দেখাইতে গেলে প্রবন্ধটীর কলেবর বৃদ্ধি হয় তাই বিরত হইলাম। এক কথায় বিজ্ঞান এখনও আমাদের শাস্ত্রান্তর্গত বহুতর বিষয়ের ছায়াস্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। তবে যে দু একটী তত্ত্ব বিজ্ঞানের সাহায্যে বহির্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহা যে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের অবিদিত ছিল ইহা নহে। আর্য্য ঋষিগণ তত্তৎ বিষয়ের কর্ত্তব্যতা মাত্র প্রকটিত করিতে উদ্যত হইয়া উপকারিতাকে গৌণভাবে রাখিয়া গিয়াছেন। উদ্দেশ্য—পাপাঙ্কুর সকামধর্ম্মের প্রাবল্য দূরীভূত করিয়া, নিষ্কাম ধর্ম্মেরই জয়পতাকা উড্ডীন করা। তবে সংপ্রতি যুগমাহাত্ম্যে পাপ সকামধর্ম্মের অনন্য আধিপত্যে অধঃপাতের পথ পরিষ্কৃত হইবে বলিয়া গৌণ পক্ষই মুখ্য ও মুখ্য পক্ষ গৌণ এবং অনা-

দরণীয় হইতে বসিয়াছে। তাহা না হইলে ইদানীন্তন একজন মাত্র বৈজ্ঞানিক আমেরিকান সাহেবের নিকট গঙ্গাজলের লঘুতা ও পাচকতা ইত্যাদি উপকারের কথা একবার মাত্র শুনিয়া, আমাদিগের নব্য সমাজ তাহার পক্ষপাতে বদ্ধপরিকর হইলেন কেন? আর আবাহমান কাল ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যঋষিমণ্ডলী যে, এই পবিত্র গঙ্গাজলের পবিত্র স্পর্শে ইহকাল ও পরকাল পবিত্র করিতে ভূরি ভূরি উপদেশ প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতেই বা সমাজ সন্দিহান ছিলেন কেন? ফল একই হইল, কেবল গঙ্গাজলের মুখ্য পবিত্রতা দূরে গিয়া গৌণ উপকারিতাই এ ক্ষেত্রে জয়শ্রী লাভ করিল। তাই বলিতেছিলাম, বিজ্ঞান আপাতঃমধুর গৌণ পক্ষকে তন্নতন্ন ভাবে দেখাইয়া পাপ সকামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছে। নিষ্কাম ধর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী সেই প্রত্ন ঋষিগণ. অনায়াসে সমস্ত অবগত হইয়া থাকিলেও এ পক্ষকে গৌণ রাখিয়া মুখ্যপক্ষ নিত্য কর্ত্তব্যতাকেই বিশেষরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। অতএব বুঝিবার দোষে ভাষানুবাদের উপকারাভাসেই অনেকেই মুগ্ধ হইতেছেন। ফলতঃ তাহাতে অনুপকার হইতেছে। আরও দেখুন, অনেকেরই ধারণা যে, পূর্ব্বে নাকি যাঁহারা কিছু জানিতেন তাহা প্রকাশ না করিয়া অনেককে উৎকণ্ঠিত করিতেন। ভাষানুবাদের প্রভাবে আজ তাহা নাই। ইহা সত্য হইলেও পূর্ব্বপ্রথা মন্দ ছিল না। তদ্দ্বারা শাস্ত্রের মর্য্যাদা ছিল; এবং যথাপাত্রেই তাহা অর্পিত হইত। সম্প্রতি আব্রহ্মচণ্ডাল সকলেই

বেদে অধিকারী, সকলেই বেদতত্ত্ববিদ্। পারিজাত মঞ্জরীতে আজ একা ইন্দ্রাণীর অধিকার নাই। শুনী, শুকরী, বানরী সকলেরই অধিকৃত হইয়া পদদলিত হইতেছে। বৈজয়ন্তী আজি ভগবানের কণ্ঠচ্যুত হইয়া বানরের হস্তে খণ্ড খণ্ড হইতেছে। ইহাই যদি সদ্বস্তুর সদ্ব্যবহার, তাহা হইলে স্বীকার করিলাম, ভাষানুবাদ আমাদের প্রভূত উপকারী। হায়! বলিতেও দুঃখ হয়, বেদের নাম আজ হইয়াছে,'চাষার গান।' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন উঠিয়া গিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় জীব ও ব্রহ্ম, আর ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় উঠিয়া গিয়া মন ও বুদ্ধি হইলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি হইলেন আশা। এইরূপ অভিধান ছাড়া অভূতপূর্ব্ব অচিন্তনীয় অর্থের অবতারণা করিয়া ভাষানুবাদ যদি আমাদের উপকার করিয়া থাকে, তাহা হইলে বলিবার কিছুই নাই। তাহা না হইলে ভাষানুবাদ যে, প্রকারান্তরে ভয়ঙ্কর অনিষ্টের সূত্রপাত করিতেছে ইহা কে না বলিবে? অনেকের বিশ্বাস, পূর্ব্বে যাহা আমাদের একটা বিস্মৃতির ভয় ছিল, ভাষানুবাদের দ্বারা আজ তাহা নাই। বিস্মৃতির ভয় নাই সত্য, পরন্তু ভাষানু-বাদে নিশ্চিন্ত হইয়া মানসিক উন্নতির অনন্য নিদান সেই গবেষণাই আমাদের উঠিয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতে আর যে কোন বিষয় চিন্তাপথে আসিয়া প্রতিভার বিকাশ সাধন করিবে ইহার আশা নাই। বোধ হয় কিছুদিন পরে প্রত্যেক কথাতেই পুস্তক খুলিতে হইবে। পূর্ব্বে কোনও এক বিষয়ের চিন্তা করিতে বসিলে তদানুষঙ্গিক কত বিষয়ই জানিতে সক্ষম হওয়া

যাইত। সম্প্রতি ভাষানুবাদে নিশ্চিন্ত হইয়া আমাদের ধীশক্তি এতই সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে যে, নিগূঢ় বিষয় ভাবা ত দূরের কথা, সামান্য একটী বিধি ব্যবস্থা দিতে হইলে বা যৎসামান্য একটী শব্দার্থ জানিতে হইলে পুস্তকের পাতা না উল্টাইয়া আর রক্ষা নাই। পূর্ব্বে পাণ্ডিত্য ছিল অন্তরে, সম্প্রতি পাণ্ডিত্যের নিবাসভূমি পুস্তক। যখন পরহস্তগত ধন ধনই নয়, পুস্তকস্থা বিদ্যা বিদ্যাই নয়, তখন কি করিয়া বলিব যে, ভাষানুবাদের দ্বারা বিদ্যার উন্নতি হইতেছে? পুস্তকের সদ্ভাবে পাণ্ডিত্য— পুস্তকাভাবে মূর্খতা ইহাইত হইল ভাষানুবাদের পরিণাম। জানি না ভাষানুবাদের দ্বারা সার নিচয় তাম্রফলকে খোদিত হইতেছে কি জলে মিলিত হইতেছে।

উপসংহারে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ভাষানুবাদে যাঁহাদের পাণ্ডিত্য, তাঁহারা যদি পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হন, তাহা হইলে দরিদ্রগণের "ভূমিখাত নিধানেণ ধনেন ধনিনো বয়ং" এই উক্তিরই বা দোষ কি? সুহৃদয় পাঠকগণের নিকটে উভয় পক্ষের বক্তব্য সমূহ উপস্থাপিত করিলাম, একবার চিন্তরূপ তুলাদণ্ডে ফেলিয়া দেখুন, কোন পক্ষ গুরু ও কোন পক্ষ লঘু হয়। যদি আমাদিগকে মীমাংসা করিতে বলেন, তাহা হইলে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে—

"স্তুবন্তি গুর্ব্বীমভিধেয় সম্পদং বিশুদ্ধি মুক্তেরপরে বিপশ্চিতঃ॥
ইতিস্থিতায়াং প্রতি পুরুষং রুচৌ সুদুর্লভাঃ সর্ব্বমনোরমাগিরঃ॥"

মানব-জীবনে সুখের স্থান।

(প্রথম স্তবক।)

সুখ বলিয়া যে একটা সর্ব্ববাদীসম্মত জিনিষ বর্ত্তমান আছে, বোধ হয় এ বিষয়ে কাহারও বিপ্রতিপত্তি নাই।

যে সুখের আশায় প্রাণীমাত্রেই জীবন-সংগ্রামের সেনা-পতিত্বে বৃত, যে সুখের আশায় জীবমাত্রেই কেহবা জ্ঞাতসারে কেহবা অজ্ঞাতে ভবের হাটে বেচাকেনা করিতেছে; যে সুখ-লিপ্সা হৃদয়ে উদিত হইলে, ধর্ম্মরাজের ভ্রূকুটি-কুটিল ভয়ঙ্কর তীর্য্যক্‌দর্শনও চিত্তকে বিহ্বল করিতে সমর্থ হয় না, জলধির ভীষণ গর্জ্জন, জলরাশির সাংঘাতিক আলোড়ন, উর্ম্মীমালার ভয়ঙ্কর উদ্বর্ত্তন যে সুখলিপ্সার অণুমাত্র অন্যথা করিতে পারেনা, গভীর অরণ্যে শ্বাপদকুলের মারাত্মক বিকট নিনাদও যে সুখ-লিপ্সায় অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়, এক কথায় যে সুখের আশায় প্রাণী প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সে সুখের কোন্‌টী প্রকৃত সুখ? কোন্ অবস্থায় আমরা সে সুখের প্রকৃত অধিকারী? কোন্ অবস্থায় আমরা প্রকৃত সুখী? তাহার আলো-চনা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

ঐ দেখুন—জটাজূটধারী জীর্ণশীর্ণকায় বল্কলবাসা একজন মানব, শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যে অনাহারে সমাধিস্থ। অন্যদিকে দেখুন—একজন পুত্র-কলত্র-ভাই-বন্ধু-স্বজন-পরিজন সব ভুলিয়া, জলধির অসংখ্য লহরীর সহিত স্বীয় সুখাশার অসীম লহরী

নাচাইতে নাচাইতে সুদূর সমুদ্র পারে চলিয়াছেন। আবার ফিরিয়া দেখুন—অন্যদিকে দেখিবেন একজন জ্বলন্ত অনলের দিগন্তদাহী শিখায় নবনীত কোমল অঙ্গযষ্টিখানি চিরদিনের জন্য ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতেছে। এরূপ কয়টী বলিব? এতাদৃশ ভূরি ভূরি বিসদৃশ দৃশ্য যাহা কিছু নেত্রাগ্রে প্রতিনিয়ত নৃত্য করিতেছে, ইহার মূল ভিত্তি প্রবল প্ররোচক একমাত্র সেই সুখের আশা—সুখের প্রত্যাশা।

এইত গেল সংসারীর ব্যাপার; অন্যদিকে দার্শনিকগণের সহিত আলাপ করিয়া দেখুন, যুক্তির ফোয়ারা খুলিয়া দিয়া নৈয়ায়িক বলিবেন, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই পরম সুখ বা মুক্তি। কপিল বলিবেন, পুরুষের সহিত প্রাকৃতিক দুঃখাদির কাল্পনিক সম্বন্ধ রাহিত্যই মোক্ষ বা পরম সুখ। স্থূলতঃ অধিকাংশ দার্শনিক, কেহবা স্পষ্ট ভাষায় কেহবা প্রকারান্তরে দুঃখাভাব বা পরমানন্দ লাভেরই সারবত্তা প্রদর্শন করিয়াছেন। অবশ্য বৈদান্তিকগণ, প্রাপ্য বা প্রাপ্ত বলিয়া কিছুই রাখেন নাই। তাঁহাদের মতে দুঃখও যেরূপ উপেক্ষার বিষয়, সুখও সেইরূপ উপেক্ষণীয়। তাহা হইলেও তাঁহারা মানবকে যে অবস্থায় অগ্রসর হইতে উপদেশ দেন, যেরূপভাবে আত্ম-পরিচয় করাইয়া দেন, শর্করাপিণ্ডকে সরবতে অথবা লবণপিণ্ডকে সমুদ্রের জলে মিশিবার ন্যায় আমাদিগকে যেখানে মিশিয়া চিরদিনের জন্য কাল্পনিক আত্মসত্তা ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন, সে যে আনন্দ-সমুদ্র—পরমানন্দ-সন্দোহ। সেখানে জরা নাই, ব্যাধি নাই,

শোক নাই, মোহ নাই, ভয় নাই, দ্বেষ নাই, হিংসা নাই—এক কথায় কোনও দুঃখ নাই বা দুঃখের কারণই নাই। তাহা হইলেত কোন এক অনির্ব্বচনীয় সুখই আসিয়া পড়িতেছে এবং দার্শনিকগণের উদ্দেশ্যও যে সেই সুখের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, ইহা না বলিয়া পারা যায় না। ঘোর সংসারী ও উচ্চ দার্শনিকগণ সুখের সম্বন্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। আস্তিককে পরিত্যাগ করিয়া নাস্তিকের নিকট যান, তাঁহারাত বক্ষঃ স্ফীত করিয়া বাহ্বাস্ফোট দিয়া বলিবেন—

"যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥"

যাবজ্জীবন সুখে থাক। ঋণ করিয়াও ঘৃত খাও। দেহ একবার ভস্মীভূত হইলে আর ফিরিবার নহে। যাঁহারা পরজন্ম মানেন, তাঁহারা না হয় সংসারের অনন্তকালের জন্য অনন্ত সুখের প্রয়াসী হইলেন, প্রত্যক্ষবাদী পরকালদ্বেষী চার্ব্বাকও ত সুখের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান নহে।

কি সংসারী, কি বিরাগী, কি আস্তিক কি নাস্তিক সকলেই সমস্বরে সুখের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন, সুতরাং সেই সুখের অবসর ও অধিকারী নির্ণয় করা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়না। আজকার প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় তাহাই।

অন্যান্য প্রাণীর সুখ সমালোচনা একেবারে অভ্রান্ত হইবে কি না জানিনা, অতএব মানব-জীবনের কয়েকটী অবস্থা লইয়া আমরা সুখবিষয়ক সমালোচনা করিব। অসংখ্য প্রকারের

অসংখ্য অবস্থা থাকিলেও মানবের স্থূলতঃ বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য এই অবস্থা তিনটী লইয়া অল্পাধিক আলোচনা করিলে, আবান্তরীণ বহুবিধ অবস্থা আপাততঃ আলোচিত হইতে পারে। ইহা ব্যতীত মানবের সর্ব্ব আদিম ভ্রূণাবস্থার কথা আলোচনা করাও সঙ্গত মনে করি। আজকার প্রবন্ধে আমরা মানবের সর্ব্ব আদিম ভ্রূণাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া, শিশুর পাঠারম্ভ পর্য্যন্ত আলোচনা করিব। ক্রমে যৌবন ও বার্দ্ধক্যের কথা আলোচনা করা যাইবে।

প্রায় মনে হইয়া থাকে, গর্ভাবস্থায় জরায়ু-শায়িত শিশুর ন্যায় সুখী আর কেহই নাই। তাহার মায়া নাই, মমতা নাই, অভাব নাই, অভিযোগ নাই, কামনা নাই সুতরাং দুঃখ, সুখ, মোহ কোনও জঞ্জালই নাই। সে একজন নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ মহাযোগী। তাহার চিত্ত নির্ব্বাত দীপের ন্যায় নিষ্কম্প—নিরন্তরায়। অতএব যদি সুখী হয়ত মানব এই অবস্থাতেই প্রকৃত সুখী।

কথাটা আপাততঃ বিশ্বাস্য সন্দেহ নাই, পরন্তু গর্ভাবস্থায় শিশুর ক্রমিক অবস্থা যে কিরূপ, তাহা আমাদের অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বিবেকের কার্য্য নহে; সর্ব্বজ্ঞ বেদ অথবা তদঙ্গ উপনিষদ্ কি বলেন, তাহা দেখা উচিত।

গর্ভোপনিষদ্ বলেন,—সপ্তধাতুকমিতি কস্মাৎ শুক্লো রক্তঃ কৃষ্ণো ধূম্রঃ পীতঃ কপিলঃ পাণ্ডুরঃ ইতি। যথা দেবদত্তস্য দ্রব্যাদি

বিষয়া জীয়ন্তে পরস্পরং সৌম্যগুণত্বাৎ ষড়্‌বিধো রসঃ রসাচ্ছো-ণিতং শোণিতান্মাংসং মাংসান্মেদো মেদসঃ স্নায়বঃ স্নায়ুভ্যোঽস্থীনি অস্থিভ্যো মজ্জা মজ্জাতঃ শুক্রং শুক্রশোণিত সংযোগাদাবর্ত্ততে গর্ভো হৃদি ব্যবস্থাং নয়তি হৃদয়েঽন্তরাগ্নি অগ্নিস্থানে পিত্তং পিত্ত-স্থানে বায়ুঃ বায়ুতো হৃদয়ং প্রাজাপত্যাৎক্রমাৎ।

ঋতুকালে সম্প্রযোগাদেক রাত্রোষিতং কললং ভবতি, সপ্ত-রাত্রোষিতং বুদ্বুদং অর্দ্ধমাসাভ্যান্তরে পিণ্ডং মাসাভ্যান্তরে কঠিনং মাসদ্বয়েন শিরঃ মাসত্রয়েণ পাদপ্রদেশঃ চতুর্থে গুল্‌ফ-জঠর-কটি-প্রদেশাঃ পঞ্চমে পৃষ্ঠবংশঃ ষষ্ঠে মুখ-নাসিকাক্ষি-শ্রোত্রাণি সপ্তমে জীবনেন সংযুক্তঃ অষ্টমে সর্ব্বলক্ষণ সম্পূর্ণঃ পিতুরেতোঽতিরেকাৎ পুরুষঃ মাতুরেতোঽতিরেকাৎ স্ত্রীঃ উভয়োবীজ তুল্যত্বান্নপুংসকং ব্যাকুলিত মনসোঽন্ধা খঞ্জাঃ কুব্জা বামনা ভবন্তি। অন্যোঽন্য বায়ুপরিপীড়িত শুক্র দ্বৈ বিধ্যাদ্‌ দ্বিধা তনুঃ স্যাদ্‌ যুগ্মাঃ প্রজা-য়ন্তে। পঞ্চাত্মকঃ সমর্থঃ পঞ্চাত্মিকা চেতসা বুদ্ধির্গন্ধরসাদি জ্ঞানাক্ষরাক্ষরমোঙ্কারং চিন্তয়তীতি তদেকাক্ষরং জ্ঞাত্বাষ্টৌ প্রকৃ-তয়ঃ ষোড়শবিকারাঃ শরীরে তস্যৈব দেহিনঃ। অথ মাত্রাশিত পীতনাড়ীসূত্রগতেন প্রাণ আপ্যায়তে। অথ নবমে মাসি সর্ব্ব-লক্ষণজ্ঞানসম্পূর্ণো ভবতি, পূর্ব্বজাতং স্মরতি শুভাশুভঞ্চ কর্ম্ম বিন্দতি। পূর্ব্বযোনিসহস্রাণি দৃষ্টাচৈব ততো ময়া। আহারা বিবিধা ভুক্তাঃ পীতা নানাবিধাঃ স্তনাঃ। জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জন্মশ্চৈব পুনঃ পুনঃ। যন্ময়া পরিজনস্যার্থে কৃতং কর্ম্ম শুভা-শুভং। একাকী তেন দহ্যেঽহং গতাস্তে ফলভোগিনঃ। অহো

দুঃখোদধৌ মগ্নো ন পশ্যামি প্রতিক্রিয়াম্। যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎপ্রপদ্যে মহেশ্বরং। অশুভ ক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তি-প্রদায়কং। যদি যোন্যাঃ প্রমুঞ্চামি ধ্যায়ে ব্রহ্ম সনাতনম্। অথ যোনিদ্বারং সম্প্রাপ্তো যন্ত্রেণা পীড্যমানো মহতা দুঃখেন জাত মাত্রস্তু বৈষ্ণবেন বায়ুনা সংস্পৃষ্টস্তদা ন স্মরতি জন্ম মরণানি ন চ কর্ম্ম শুভাশুভং বিন্দতি।

এই দেহকে সপ্তধাতু বলে। পুরুষ শুক্ল, কৃষ্ণ, ধূম্র, পীত, কপিল ও পাণ্ডুর, এই সাত প্রকার বর্ণবিশিষ্ট বস্তু আহার করে। ইহারা পরস্পর অনুকূল-গুণ সম্পন্ন বলিয়া রসাদি ষড়্বিধরূপে পরিণত হয়। রস সমস্ত ধাতুর মূল কিন্তু ধাতু নহে। এই রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে স্নায়ু, স্নায়ু হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র হয়। যথাকালে যথারীতি শুক্র ও শোণিতের সংযোগ হইলে গর্ভের সঞ্চার হয়। পূর্ব্বোক্ত ধাতু সকল হৃদয়ে অবস্থিত আছে এবং হৃদয়দেশে অন্তরাগ্নি বিদ্যমান আছে। সেই অগ্নিস্থানে পিত্ত এবং পিত্তস্থানে বায়ু বিদ্যমান আছে, কেননা বায়ু ভিন্ন অগ্নির প্রবৃত্তি হইতে পারে না; এই বায়ু হইতে প্রাজাপত্য ক্রম অনুসারে হৃদয় উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ যেরূপ প্রজাপতি আত্মাকে দ্বিধা করিয়া একভাগে পতি ও অপর ভাগে পত্নীরূপে আবির্ভূত হন, তদ্রূপ পিতার হৃদয়োপলক্ষিত লিঙ্গও দ্বিধা বিভক্ত হয়। ঋতুকালে পুং বীজ স্ত্রীধাতু পোষণ করে। এই কারণে স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগে স্ত্রীর তেজ আধিক্য হইয়া থাকে।

ঋতুকালে স্ত্রী ও পুরুষের সম্পর্ক বশতঃ শুক্র শোণিত একত্র সম্মিলিত হইয়া এক রাত্রিতেই ঈষৎ গাঢ়রূপে পরিণত হয়। তৎপরে সপ্ত রাত্রি অতীত হইলে উহা বর্ত্তুলাকার হয়। অর্দ্ধ মাসের মধ্যে পিণ্ডাকার, মাস সম্পূর্ণ হইলে ঐ পিণ্ড কঠিন হয়, এবং দুই মাসে শির, তিন মাসে পাদপ্রদেশ, চতুর্থ মাসে গুলফ উদর ও কটিদেশ, পঞ্চম মাসে পৃষ্ঠ, ষষ্ঠ মাসে মুখ, নাসিকা ও চক্ষু এবং সপ্তম মাসে জীবনের সহিত অর্থাৎ জীবোৎপত্তির পরিচায়ক চলনাদি জন্মে এবং অষ্টম মাসে গর্ভ সর্ব্বলক্ষণ সম্পূর্ণ হয়। স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগ সময়ে যদি পুরুষের শুক্রাধিক্য হয় তবে পুরুষ, আর স্ত্রীর ঋতুর আধিক্য হইলে স্ত্রী এবং স্ত্রী পুরুষের বীজের সমতা হইলে নপুংসক, ব্যাকুলিত চিত্তবিশিষ্ট অন্ধ, খঞ্জ, কুব্জ ও বামনের উৎপত্তি হয়। স্ত্রী-পুরুষের শুক্র-শোণিত বায়ু দ্বারা পরিপীড়িত হইয়া দ্বিধাভাগে পরিচালিত হইলে, যুগ্ম সন্তান (যমজ) উৎপন্ন হইয়া থাকে। পঞ্চভূতাত্মক এই পিণ্ড চিন্তনাদি কার্য্যে সমর্থ। শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই পাঁচটাই বুদ্ধির বিষয়। এই বুদ্ধি অন্তঃকরণ দ্বারা রসাদির জ্ঞান করিয়া থাকে এবং অনিত্য বস্তু ও নিত্য ওঁকার পদার্থের চিন্তা করে। এই দেহে প্রকৃতি মহতত্ত্ব (বুদ্ধি) অহং-কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই অষ্ট প্রকৃতি এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ স্থূলভূত এবং মন এই ষোড়শ বিকৃত পদার্থ বিদ্যমান আছে।

নারীর গর্ভস্থ শিশুর নাভি হইতে মাতার হৃদয় পর্য্যন্ত

সম্বন্ধ আছে, তদ্দারা মাতার ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের রস গ্রহণ করিয়া গর্ভস্থ সন্তানের প্রাণ আপ্যায়িত হয়। অনন্তর নবম মাসে গর্ভস্থ সন্তান সর্ব্বলক্ষণ ও সর্ব্ব জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া পূর্ব্ব-জন্ম স্মরণ করে এবং তাহার শুভাশুভ কর্ম্মের জ্ঞান জন্মে।

নবম মাসে শিশু এই প্রকার চিন্তা করিতে থাকে যে, আমি পূর্ব্বে সহস্র সহস্র যোনি ভ্রমণ করিয়াছি, তৎপরে যোনির দ্বার হইতে নির্গত হইয়া বিবিধ ভোগ্যবস্তু আহার ও নানা প্রকার স্তন পান করিয়াছি; একবার জন্ম আবার মৃত্যু, আবার জন্ম আবার মৃত্যু, এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যু ভোগ করিয়াছি। আমি পরিজন পোষণের নিমিত্ত কত শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, কিন্তু যাহাদের নিমিত্ত করিয়াছি, তাহারা তদ্দারা পীড়িত হইতেছে না। এক আমিই সেই শুভা-শুভ কর্ম্মের দ্বারা দগ্ধ হইতেছি। কি পরিতাপের বিষয়! আমি এখন এই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, ইহা হইতে উদ্ধারের কোনই উপায় দেখিতেছি না। যদি একবার এই যোনিদ্বার হইতে মুক্ত হইতে পারি, তবে অশুভক্ষয়কারী মুক্তি-ফলদায়ী মহেশ্বরকে প্রপন্ন হইব। আবার ভাবিতেছি, যদি এই যোনি হইতে মুক্ত হইতে পারি, তবে অশুভ বিনাশী মোক্ষ-ফলপ্রদ নারায়ণকে সেবা করিব। যদি এবার যোনি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারি, তবে অশুভ-বিনাশক যোগ অভ্যাস করিব। এবার যদি যোনি হইতে বিমুক্ত হইতে পারি, তবে সনাতন ব্রহ্মপদার্থের ধ্যান করিব।

এই প্রকার চিন্তা করিয়া গর্ভস্থ শিশু যোনিদ্বারে আসিয়া সমাগত হয়। তখন জরায়ুর পীড়নে অতিশয় দুঃখ পাইয়া জন্ম লাভ করে। সেই সময়ে বৈষ্ণবী মায়া দ্বারা বিমুগ্ধ হইয়া জন্ম-মরণাদি স্মরণ করে না এবং শুভাশুভ কর্ম্মও আর জানিতে পায় না।

বেদে যদি বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, ব্যাস, বশিষ্ঠ কপিল এবং শঙ্করাদি যদি আমাদের নিকট অসার অপদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে উপর্য্যুক্ত বেদবাক্য লইয়া সুধীগণ বিবেচনা করুন, পূর্ব্বোক্ত সেই সর্ব্বজঞ্জালবিহীন সমাধিস্থ গর্ভস্থ শিশুটী কত সুখী।

জন্যজনক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া, ব্যবহার জগতে বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া দেখিলে, যাহার জীবন অন্যের জীবনের সত্তার অধীন, অন্য ভুক্ত অন্নরসে যাহার প্রাণ রক্ষা হয়, সে যদি সুখী হয় ত অন্নদাস অপদস্থ কেন?

বিস্মূত্রমালাকুল গর্ভাশয় যদি সুখের স্থান হয় ত বিষ্ঠা কৃমি বিরাগের পাত্র কেন? এক কথায় যে যে বস্তু অস্পৃশ্য অমেধ্য বলিয়া দূর হইতে পরিহার করি, সেই সেই বিষয়ের সংস্রবকালে যদি মানব প্রকৃতি সুখী হইবে, তবে দুঃখের স্থান কোথায় জানি না। বলিতে পারেন কোনও সুখ কি দুঃখ সর্ব্ববাদী সম্মত হয় না, হইবার নহে। একে যাহাকে অমৃত বলিয়া অনুধাবন করে, অন্যে তাহাকে হলাহল বলিয়া দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সুতরাং আমাদের বুদ্ধিতে

গর্ভস্থ শিশুর ঘৃণিত অবস্থান আভাসে আভাসিত হউক শিশু কিন্তু প্রকৃতই সুখী, ইহাও সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। শিশু যদি গর্ভাবস্থায় সুখে অবস্থান করিত, তাহা হইলে প্রসবকালে যোড় হাতে সকরুণভাবে ভগবানের উদ্দেশে স্বীয় অনাদি জন্ম মৃত্যু পরম্পরার উল্লেখ করিয়া বলিত কি (হে দেব !) আমি জন্ম মৃত্যু পরম্পরায় সহস্র যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে যাহাদের জন্য এত করিলাম, সেই বন্ধুবান্ধব স্বজন কেহই এ অভাগার কষ্টভাগী হইল না। সকলেই ফলভোগ করিয়া চলিয়া গেল, আমি একাই অনন্ত দুঃখসাগরে পড়িয়া জর্জ্জরিত হইতেছি, ইহা হইতে উদ্ধারের কোনও পথ দেখিতেছি না। হে অশুভ-ক্ষয়কারি ! ভয়হারি ! ত্রিপুরারে ! হে বিপত্তিবারণ ! মধু-সূদন ! নারায়ণ ! এ অসহায় অধমকে যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার কর। এবার যদি যোনি-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি, তাহা হইলে আমি মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইব, নারায়ণের পূজা করিব, সাংখ্যযোগ অভ্যাস করিব —ব্রহ্ম পদার্থের ধ্যান করিব।

এইত গর্ভস্থ শিশুর সুখের পরাকাষ্ঠা। অতএব কি করিয়া বলিতে পারি যে, গর্ভাবস্থা সুখের প্রকৃত স্থল ?

অতঃপর ভূমিষ্ঠ শিশুর সুখ সমালোচনা করা যাউক। মনে হইতে পারে শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে মলমূত্র সংবলিত গর্ভাশয়ে অবস্থান এবং গর্ভগত যন্ত্রণা দূরীভূত হয়, সুতরাং এই অবস্থাই মানব জীবনের সুখাধার—ইহাই পরমানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ ভোগের উপযুক্ত সময়। কথাটা আপাতরম্য হইলেও বিশ্লেষণ করিয়া

বিচার করা উচিত। ভূমিষ্ঠ শিশুর উত্তানশায়ী অবস্থা হইতে পাঠারম্ভ পর্য্যন্ত পারম্পরিক অবস্থার সমালোচনা করিলে দেখা যায়, উত্তানশায়ী অবস্থায় শিশু কেবল গর্ভাবাসক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, এই পর্য্যন্তই বলিতে পারা যায়। অন্যের হাতে জীবনের ভার সমর্পণ, অন্যের অনুমানে জীবনের অস্তিত্ব, এক শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যতীত জীবনের তাবৎ ব্যাপারই অন্যের হস্তে ন্যস্ত করিয়া বাঁচিয়া থাকা যদি সুখের কারণ হয়, লৌহকারের ভস্ত্রা অচেতন হইয়াও পরম সুখী বলিতে হইবে।

বলিতে পারেন ঈশ্বরের নিয়মই হইতেছে, শিশুর ভার পিতামাতা বা তৎকল্প সহৃদয় ব্যক্তিবৃন্দের নিকট ন্যস্ত হইবেই। পিতামাতা তাহার রক্ষাবিধানে বাধ্য। তাহা হইলেও ব্যবহার দৃষ্টিতে দেখুন যে অবস্থায় প্রাণী নিজের হিতাহিত না বুঝিয়া কান্না করিয়া এবং বস্তুর গুণাগুণ না বুঝিয়া তাহার সংস্রবে প্রাণান্ত কষ্ট উপভোগ করিতে বাধ্য সে অবস্থা সুখের কি?

বালক অগ্নির দাহিকা শক্তি, জলের গভীরতা, সর্পের সাঙ্ঘাতিক দংশন ইত্যাদি প্রাণান্তকারী ঘটনা বুঝেনা, কিন্তু অনলে দগ্ধ হইলে, জলে মগ্ন হইলে বা সর্পদষ্ট হইলে, যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সে অবস্থায় মানব-জীবন সুখময় ইহা বলা যাইতে পারে কি? সুখের তারতম্য থাকে থাকুক, তা বলিয়া প্রকৃত সর্ব্বসুখে সুখী বলা সঙ্গত হয় কি?

আরও দেখুন গর্ভাবস্থায় শিশু অবশ্য মলমূত্রভাণ্ডের কিছু

ব্যবহিত স্থানে অবস্থান করিতেছিল, ভূমিষ্ঠ হইয়া সাক্ষাৎ মলমূত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া, উচ্চৈঃ ক্রন্দন এবং অন্য কর্ত্তৃক অনুকম্পিত হইলে সেই নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। অধিকন্তু সেই মলমূত্র যে গলাধঃকৃত না হয় তাহাও নহে। বাল্যাবস্থার এইত পরিণাম—এইত সুখ। জানিতাম জ্ঞানের স্ফূরণ হইলে—চলচ্ছক্তি হইলে, সে সব দুঃখ বা দুঃখের কারণ তিরোহিত হইয়া সুখের পূর্ণাবির্ভাব হয়। তাহাও দেখিনা। ক্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়াদেবীর ক্রীড়নক হইতে থাকে। ক্রমে অভাব বুঝে, অভিযোগ শুনে, হিংসা প্রতিহিংসার ঘাত প্রতিঘাত স্পর্শ করে, ক্রীড়ার প্রাতিকূল্য দেখিলে মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করে, পাঠশালা, কারাগার অপেক্ষা ভীষণ বোধ হয়। তাই বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—"বিদ্যাগারগতো বালঃ পরামেতি কদর্থনাং।" বস্তুতই দেখিতে পাওয়া যায়, বালক মৃত্যুমুখে যাইতে প্রস্তুত, তথাপি প্রাথমিক পাঠাবস্থায় পাঠশালায় যাইতে একান্ত কাতর।

মেদিনীপুরের ভাষা।

মেদিনীপুরের ভাষার বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে মেদিনীপুরের স্থূল ইতিহাস আলোচনা করা সঙ্গত মনে করি; কারণ মেদিনীপুরের একটী স্থায়ী ভাষা নাই। নানা কারণে

এখানকার ভাষা অতীব বিমিশ্র। মেদিনীপুর, বাঙ্গালার ছোট-লাটের শাসনাধীন একটী জেলা। অক্ষাংশ ২১০৩৭ হইতে ২২০৫৭ উঃ এবং দ্রাঘিমা ৮৬'৩৫৪৫ হইতে ৮৮'১৪ পূঃ মধ্য। এই জেলা বৰ্দ্ধমান বিভাগের সর্ব্ব দক্ষিণাংশে অবস্থিত। ইহার উত্তরে বাঁকুড়া, উত্তর-পূর্ব্বে হুগলী, পূর্ব্বে হাবড়া, দক্ষিণে বঙ্গো-পসাগর, দক্ষিণ পশ্চিমে বালেশ্বর, পশ্চিমে ময়ূরভঞ্জ সামন্ত রাজ্য ও সিংহভূম এবং উত্তর-পশ্চিমে মানভূম জেলা। মেদিনীপুর নগর ইহার সদর বিচারালয়।

জেলাটী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। প্রধানতঃ এই স্থানকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়; ১ সমুদ্র-সৈকত, ২ 'ব' দ্বীপভূমি, ৩ সমতল ও উচ্চভূমি। একমাত্র পশ্চিম ভূভাগের নতোন্নত শৈল-সানু-সমন্বিত পাৰ্ব্বত্য বনভূমি ব্যতীত অপর সকল স্থানেই কৃষিকার্য্যের আধিক্য দৃষ্ট হয়। বন্যপাদপ-পরিশোভিত এই পার্ব্বত্য জঙ্গলময় ভূভাগ "জঙ্গল-মহল" নামে পরিচিত।

সমগ্র জেলার প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া অনুমান হয় যে, বহু পূর্ব্বকালে পশ্চিম দেশভাগ গভীর জঙ্গলে আবৃত ছিল; ক্রমে পার্ব্বতীয় অনার্য্য জাতীয়েরা আর্য্য সভ্যতার সংশ্রবে পড়িয়া, জঙ্গল কাটিয়া অনেক স্থান আবাদ করিয়া বসবাস আরম্ভ করে। পরে অনেক লোক দক্ষিণ বঙ্গের নানাস্থান হইতে বাণিজ্য ব্যপদেশে উপস্থিত হইয়া এই জেলাকে সভ্যজাতির বাসভূমি বলিয়া পরিচিত করে। সমুদ্রো-পকূলবর্ত্তী গাঙ্গেয় মোহানাস্থিত তমলুক (তাম্রলিপ্ত) নগরী স্বীয়

প্রাচীন কীর্ত্তি গৌরব বিকাশ করিতেছে। প্রাচীন বৌদ্ধগণ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এই নগরে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। সমুদ্র পথে বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা ভাবিয়া তাঁহারা এইস্থানে একটী বন্দর স্থাপন করিয়াছিলেন। এইস্থান হইতেই ভারতীয় বৌদ্ধগণের ব্রহ্মরাজ্যে ও যব প্রভৃতি ভারত মহাসাগরস্থ দ্বীপসমূহে বাণিজ্য-ব্যপদেশে গমনাগমন সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দির প্রথমার্দ্ধের শেষ ভাগে প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ইউএনসিয়াং এইস্থান পরিদর্শনে আগমন করেন, তিনি তাম্রলিপ্ত নগরকে একটী মহা সমৃদ্ধিশালী বন্দররূপে বর্ণন করিয়া যান। তিনি এখানে ১০টী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, ২০০ ফিট উচ্চ একটী অশোক লাট (স্তম্ভ) ও সহস্রাধিক বৌদ্ধ শ্রমণের বাস দর্শন করিয়াছিলেন। প্রাচীন হিন্দু উপাখ্যানমালা পাঠে জানা যায় যে, এই নগর পূর্ব্বে সমুদ্রোপকূল হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। হুগলী নদীর মুখে পলি পড়িয়া সমুদ্র-সৈকত-ভূমিরূপে সমুত্থিত হওয়ায় প্রায় ৬০ মাইল স্থান ব্যবধান পড়িয়াছে। এখানকার ময়ূরবংশীয় রাজগণ ক্ষত্রিয় বংশসম্ভূত ছিলেন; এই বংশের শেষ নরপতি নিঃশঙ্ক নারায়ণ অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগত হইলে, কালু ভুঁইয়া নামক জনৈক পার্ব্বতীয় সর্দ্দার তাঁহার রাজ্য অধিকার করে। কালু সর্দ্দার হইতে তমলুকে কৈবর্ত্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথমে তাঁহারা ভুঁইয়া নামক অনার্য্য জাতি বলিয়া গণ্য ছিলেন, পরে হিন্দুধর্ম্ম

গ্রহণ করিয়া হিন্দু শ্রেণীতে মিলিত হইয়াছেন। এই বংশের বর্ত্তমান রাজা কালু হইতে ২৫ বা ২৬ পুরুষ অধস্তন হইবেন।

বাঙ্গালায় পাঠান আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই স্থানও পাঠান রাজগণের শাসনাধীন হইয়াছিল। তবে স্থান বিশেষে যে রাজা উপাধিধারী হিন্দু ভূম্যধিকারীগণ আপন আপন শাসন-শক্তি পরিচালনায় পরাঙ্মুখ ছিলেন এরূপও বলা যায় না। উদাস ও বিলাসপ্রিয় মহম্মদীয়গণকে তোষামোদে বশীভূত করিয়া দেশীয় সামন্তগণ এক সময়ে মেদিনীপুর মধ্যে স্ব স্ব প্রাধান্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ হিজ্‌লি ভাগ মুসলমানাধিকারে জলেশ্বর সরকারের অন্তর্ভূত হয়। মোগল সম্রাট আকবর সাহের সময়ে এখান হইতে ১২৫০০০০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। জলেশ্বর নগরেই ইহার সদর বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরাজ কোম্পানির সহিত মেদিনীপুরের সংশ্রব আরম্ভ হয়। উক্ত বর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মীরজাফরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া মীরকাসিমকে তৎপদে অবস্থাপিত করেন। ইনি স্বীয় পদোন্নতির বিনিময়ে কোম্পানি বাহাদুরকে মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম ও বর্দ্ধমান জেলা দিতে বাধ্য হন।

পূর্ব্ব-দক্ষিণে সমুদ্র এবং পশ্চিমে পর্ব্বত মালা বিস্তৃত থাকায় এই স্থানে বৈদেশিক শক্তির সমাগম হয় নাই। দক্ষিণ উড়িষ্যা হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণ দলে দলে আসিয়া মেদিনীপুর লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত। এক সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ সমগ্র

মেদিনীপুরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু লুণ্ঠন-প্রিয়তা হেতু তাঁহারা শাসন-দণ্ড অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন নাই।

সচরাচর কথিত হয় যে, ভারতবর্ষ সমুদয় পৃথিবীর অনুকৃতি। সেইরূপ বলা যাইতে পারে যে, মেদিনীপুর সমুদয় ভারতবর্ষের অনুকৃতি। পূর্ব্বোক্ত সীমাবদ্ধ প্রদেশটীর উত্তর ও পশ্চিম অংশ যেমন উচ্চ, দক্ষিণ ও পূর্ব্বাংশ তেমন নহে। একদিকে পর্ব্বত ও অন্যদিকে সমুদ্র। ইহার একদিকে যেমন শাল-পিয়ালাদি পাহাড়িয়া বৃক্ষ ও বিবিধ আরণ্য ফল জন্মে, অন্যদিকে তেমনি নারিকেল গুবাকাদি সাগরোপকূল-জাত বৃক্ষ ও ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। মেদিনীপুর যে, সমস্ত ভারতের অনুকৃতি তাহা রাজত্ব বিচারেও প্রতিপন্ন হয়। এদেশে উৎকলেশ্বর, বঙ্গেশ্বর, দিল্লীশ্বর ও মহারাষ্ট্রেশ্বর সকলেই এক একবার সময়ে অধিকার স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

মেদিনীপুর সম্বন্ধে স্থূলতঃ যে ইতিহাস উদ্ধৃত করা হইল, ইহাই এতদ্দেশের ভাষাগত বিমিশ্রতা বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য দিবে।

বলা বাহুল্য তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, উৎকল বা মৈথিলী যেরূপ এক একটী স্বতন্ত্র ভাষা, মেদিনীপুরের তদ্রূপ একটী স্বতন্ত্র ভাষা নাই।

মেদিনীপুরের স্থায়ী বাসিন্দা অপেক্ষা আগন্তুক অধিবাসীর আধিক্য বর্ত্তমান। অধিকার সাঙ্কর্য্য ও ধর্ম্ম সাঙ্কর্য্য যে মেদিনী-

পুরের ভাষা সাঙ্কর্য্যের এক একটী অন্যতম কারণ ইহা উপরি উক্ত ইতিহাস হইতে পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

আবার সীমাসংলগ্ন জেলাগুলির অনেক ভাষাই মেদিনীপুরের ভাষাকে বিমিশ্র করিয়া এক বিলক্ষণ ভাষা খিচুড়ির সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব মেদিনীপুরের ভাষা চিরস্থায়িনী বা স্বতন্ত্র প্রসিদ্ধ নহে। বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমানের সংশ্লিষ্ট বলিয়া মেদিনীপুরের উত্তরাঞ্চলের ভাষা অপেক্ষাকৃত বঙ্গভাষার সমকক্ষ। তবে বাঁকুড়ার সংস্পর্শ থাকায় ক্রিয়ার অঙ্কে স্থানে স্থানে ক-এর যোগ আছে। যেমন হবেক, দিবেক, খাবেক ইত্যাদি যাহা দুই একটী বিকৃত বঙ্গ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা তত ধর্ত্তব্য নহে। শব্দ সাহচর্য্য বা প্রক্রমবশতঃ তাহার অর্থ বোধগম্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বাঞ্চলটী হুগলী ও হাবড়া সংশ্লিস্ট বলিয়া তাহার ভাষা তত বিকৃত নহে—বঙ্গভাষা। দক্ষিণ পশ্চিমাংশ বালেশ্বর জেলার সংশ্লিষ্ট বলিয়া তাহার ভাষা বিকৃত উৎকল। উৎকলে যাহা সাধুভাষা বলিয়া পরিচিত ইহা তাহারই অপভ্রংশ। স্থূলতঃ ইহা এক প্রকার উৎকল ভাষা। উৎকলদেশবাসীদিগের অনায়াস বোধগম্য। মেদিনীপুরের পশ্চিমাঞ্চলটী জঙ্গলময়। ময়ূরভঞ্জ ও সিংহভূম সংশ্লিষ্ট বলিয়া ইহার ভাষা অতীব বিমিশ্র। ইহাতে কোল, ভীল, সাঁওতাল, ভূমিজ ও মাঁইতি ইত্যাদি কতিপয় জাতির ভাষা প্রবিষ্ট হইয়া এক অশ্রুতপূর্ব্ব ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার নাম এতদ্দেশে মাঝিয়া বা চাষীকথা (ভাষা)।

পাঠকগণ এই প্রবন্ধের শেষে প্রদত্ত তালিকা পাঠে সে কুতূহলের নিবৃত্তি করিবেন।

ইহা ব্যতীত মেদিনীপুরের মধ্যভাগে অর্থাৎ খান্দার ভেড়ি, ভগবানপুর, সবঙ্গ, নারায়ণগড় ও কাঁথির উত্তর পার্শ্বে একটী অতি বিচিত্র ভাষার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নাম খান্দারী বা পূবালী ভাষা। অসাধারণতা আলোচনায় মেদিনী-পুরের ভাষাকে দুইভাগে বিভক্ত করা চলে। একটী মাঝিয়া বা চাষী, অপরটী খান্দারী বা পূবালী। প্রথমতঃ মাঝিয়া বা চাষী ভাষায় অনেক স্থলে তকারান্ত শব্দের 'ত' কারের একেবারে লোপ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ভাতএর স্থলে সুধু ভা এবং হাতের স্থলে কেবল হা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হয়।

এই পঙ্গু শব্দগুলির একত্র সমাবেশে এক এক অপূর্ব্ব বাক্য রচিত হইয়া থাকে। ভাত খাইয়া হাত ধুইয়াছ? মাঝিয়া ভাষায় এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইলে বাক্য হইবে—ভা খাই হা ধুইছ? মাঝিয়া ভাষায় ক্রিয়া পদগুলির অন্তে এক একটী বিলক্ষণ বিভক্তির যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। নিখিল ভাষা-জননী সংস্কৃত ভাবা যে সাধু অসাধু তাবৎ ভাষার মূলে বর্ত্তমান তাহা বোধ হয় অসূয়াপরবশ একদেশদর্শী ব্যক্তি ব্যতীত অন্যে অস্বীকার করিবেন না।

এই মাঝিয়া ভাষার মূলেও কন্যাবৎসলা জননী গীর্ব্বাণ বাণী বর্ত্তমান। যাইতেছেন, বসিতেছেন, খাইতেছেন ইত্যাদি ক্রিয়ার মূলে ক্রমান্বয়ে যা, বস্ ও খাদ্ ধাতু বর্ত্তমান। বঙ্গভাষায়

কেবল প্রাকৃত বিভক্তিগুলিই ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রতীত হয়, পরন্তু মূল ধাতুগুলি সব সংস্কৃত।

এই অভিনব মাঝিয়া ভাষাও সংস্কৃত ধাতুনিচয়কে মূলে রাখিয়া স্ব স্ব ভাষা প্রসিদ্ধ বিভক্তি সহযোগে ক্রিয়াপদের সৃষ্টি করে; তবে ইহার বিভক্তিগুলি পাঠকগণের নিকট একটু অশ্রুতপূর্ব্বতার আভাস দিয়া কুতূহল উদ্দীপিত করিবে। ইহার ক্রিয়া বিভক্তিগুলি একবচনে "ঠে" বহুবচনে "ঞৈন"। তাহা হইলে মাঝিয়া ভাষায় পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াপদগুলি হইবে। যথা বহুবচনে যাঞৈন, বসেঞৈন ও খাঞৈন। একবচনে যায়ঠে, বসেঠে, খায়ঠে। বঙ্গভাষায় এইরূপ স্থলে প্রায়শঃ "ছে" বিভক্তির সংযোগ হয়, যেমন খাচ্ছে, যাচ্ছে, আস্‌ছে ইত্যাদি। মাঝিয়া ভাষায় ছের স্থলে "ঠে" প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ক্রিয়াপদ ব্যতীত সুবন্ত পদগুলিতেও এই ভাষায় বিলক্ষণতা আছে। যুস্মদ্ অস্মদ্ যদ্ তদ্ ইত্যাদি শব্দের উত্তর বহুবচনে প্রায় "মেনে" বিভক্তির যোগ দেখা যায় যথা—"তোমরা" স্থানে তোমার মেনে, আমরা এই স্থলে আমার মেনে, সেমেনে যেমেনে। অধিকার সাঙ্কর্য্য যে ভাষাকে অন্যরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, তাহা "বরাবরেষু" এই শব্দ হইতে সহজে প্রতীত হয়। "বরাবর" শব্দটী পার্শী। অবশ্য ইহা মুসলমানগণের আধিপত্যকালে ভারতবর্ষব্যাপী ছিল। রাজভাষা বলিয়া তৎকালে সাগ্রহে সাধারণে কণ্ঠস্থ ও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। পরন্তু শিরা-মজ্জাব্যাপিনী সংস্কৃতভাষার মমতা পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া হউক অথবা অলক্ষ্যে

কারণান্তর বশতঃ হউক, ইহার সহিত সংস্কৃত সুবন্ত বিভক্তির সংযোগে ইহা সপ্তমী বিভক্তিতে "বরাবরেষু" রূপে পরিণত হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে, অনেকগুলি শব্দের অঙ্গ কর্ত্তন ব্যবহিত মাত্রা নিচয়ের সংমিশ্রণ ও উন্মূলন ঈদৃশ ভাষা বৈসাদৃশ্যের এক একটী কারণ। পাঠকগণ, পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তালিকা হইতে তাহা অনায়াসে জানিতে পারিবেন। দুইটী ভাষার অনেকাংশে সাম্য থাকিলেও, পূবালী ভাষায় অনেকগুলি শব্দ অতি বিকৃত ও ছিন্নাবয়ব হইয়া সাধারণের দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। মাঝিয়া ভাষায় ততটা নহে। ক্রিয়াপদগুলিতেই কিছু অপূর্ব্বতা দৃষ্ট হয়।

বঙ্গভাষা	খান্দারী বা পূবালীভাষা	চাষী বা মাঝিয়া ভাষা
সিন্দুর	ঝুরা	ঝুর
মোম	ফুল সোদ	মহুম্
প্রপৌত্র	জাতকুড়	অনাতি
পলায়ন	তির্কাল	দাড়ি মাবি
জাঁতি	খিলকাৎ	খিলকান্তি
অনুমানে	আলসাট্টে	টেরটৈকন্নু
রাশিকৃত	তুজ্জ্যার	কাড়ি
ভুঁড়িওয়ালা	কঁথনা	ধুন্দাপেট
প্রহার	চিপানচণ্ডী	মাইলা
সকল বিষয়েই অসন্তুষ্ট	খুব সুঙ্গা	চিপাসিঙ্গা
মুড়কী	উখড়া ভুজা	উখড়া
সাক্ষ্য	গাবা	গুহা
অনুসন্ধান	তনখী	তনখী

বঙ্গভাষা	খান্দারী বা পূবালীভাষা	চাষী বা মাঝিয়া ভাষা
হিংসুক	হিঙ্গুসকুড়্যা	হিসকুড়িয়া
একক স্বভাব	একুলসিঙ্গা	একচিরা
অনুনয় বিনয়	অভয়লটা	ব্যস্তবাস্ত
প্রচণ্ড	লিধমা	নিধুর্মা
শূকর	শুঁড়কাটা হাতী	খুশুব
পুনঃ২ উল্লেখ	তাকুশ পাড়া	রহট
জীব	আড়া	আড়া
দমআটকান	আকুপাকু	আকুপাকু
ঘূর্ণায়মান	উড়াপাক	উড়াপাক
অপরিচ্ছন্ন	বাদবিল্লা	বিৎবল্লা
কোথায়	কাই	কোণ্ঠে
এখানে	এঠি, এঠিঠি	এঠে
সেখানে	সেঠি, সেঠিঠি	সেঠে
বিবাহ	ব্যা	ব্যাহা

বঙ্গভাষা	খান্দারী বা পূবালীভাষা	চাষী বা মাঝিয়া ভাষা	বঙ্গভাষা	খান্দারী বা পূবালী ভাষা	চাষী বা মাঝিয়া ভাষা
ধারণা	ইংপাক	হুদেশ	বিরক্ত	বিথ্যাবাই	বিথাবাই
অতি বোকা	স্যাঁকচিল্লি	স্যাঁকাচল্লি	গোঁপ	মোছ	নিস্
সর্পাঘাত	লথোড়	নহট্টোয়া	হৃষ্ট পুষ্ট	দেহৈল	ভুটকাভুটকী
টানিয়া লওয়া	ঘসরাউ	খুসরাউ	শ্বশুর	সাঁউৎ	শ্বশুরা
ঠোকর মারা	খঁ প্রাউ	খঁ প্রাউ	শ্বাশুড়ী	সাঁউতান	শ্বাশু
ভগ্নমৃৎপাত্রের ক্ষুদ্র খণ্ড	খলাংকুচি	খোপরা	চীৎকার	গুল্লি	উচ্ছাস
বিবাদ বিসম্বাদ	কিচ্‌কোল	কিচ্‌কোল	কফ, শ্লেষ্মা	খাকার	খাকার
হঠাৎ	অজমুদ্দা	হুড়মুড়্যা	ছল চাতুরী	ভুগলী	ভুগলী
পিচ্ছিল	হুড়কা	খসবা	বন্ধু বান্ধব	অরস পরস	বন্ধুবাস
হইতে	নু	নু	দাঁড়ান	ঠিয়া	ঠিয়া
পর্য্যন্ত	তাকাৎ	তক্	পিতামহ	০	গুগু
মাতুর	মসনা	মসিনা	পিতামহী	০	গুগুমা
ঘটী	টুকনা	টুকনা	বাপ	০	বাপু
ছেলে	পড়েক	স্থা			

ধর্ম্মতত্ত্ব-পরিশিষ্ট।

অধুনা অনেক স্থলে অনেক রকমের ধর্ম্ম-সভা সংস্থাপিত হইতেছে, অনেকে প্রচারক-পদবী অধিরূঢ় হইয়া স্ব স্ব রুচি ও সুবিধা অনুসারে বিবিধ সমন্বয় প্রকটিত করিয়া যশোভাগী হইতেছেন। কিন্তু কি জানি কেন প্রকৃত হিন্দুত্বাভিমানী ব্যক্তি তাহাতে সন্তোষ লাভ করিতেছেন না। তাঁহাদের মতে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অধুনা যে প্রবন্ধ পাঠ বা সমালোচনা হইতেছে, তাহাতে ধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ নির্ণীত না হইয়া, ধর্ম্ম বিষয়ে অনেকগুলি অসহনীয় সন্দেহ আসিয়া, অনেকের চিরন্তন বিশ্বাসের শীর্ণমূলকে শিথিল করিয়াছে। অনেকের হয়ত তীব্র জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ না হইয়া বৰ্দ্ধিত হয় নাই, বরং আপনাআপনি নিবৃত্তপ্রায় হইয়াছে। অনেকে অনেক রকম আপাতমধুর বাক্য, যুক্তি ও পরামর্শের সহিত সমুদাহৃত করিতেছেন কিন্তু জলের পিপাসা সুমধুর দুধে যাইবার নহে। সম্মুখে পিযূষসন্নিভ পবিত্র পেয়-পরিপূর্ণ-হিরণ্ময়-কুম্ভ থাকিলেও তৃষিত ব্যক্তি সুশীতল এক পাত্র জল ছাড়া আর কিছুই চায় না। এই কথা নৈষধকার কবি শ্রীহর্ষ স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন—

"পিপাসুতা শান্তিমুপৈতি বারিণা,
ন জাতু দুগ্ধান্মধুনোঽধিকাদপি।"

আমাদের ধর্ম্ম-সভাতে নানা শ্রেণীর মত মতান্তর মীমাংসিত হইলেও ইহা হিন্দুপ্রধান। হিন্দু ভগবদ্ভুক্তিতে অচলা ভক্তি ও অটল বিশ্বাস রাখিয়া থাকে। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

নিজের ধর্ম্ম গুণহীন হইলেও সম্যক্ অনুষ্ঠেয়, পরধর্ম্ম হইতে তাহা অতি শ্রেয়স্কর। স্বধর্ম্মে মৃত্যু শ্রেয়ঃ, পরন্তু পরের ধর্ম্ম ভয়াবহ। সুতরাং এতাদৃশ সভায় হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি যে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না ইহা সহজবোধ্য। এই সব সভা হিন্দু-ধর্ম্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুবৃন্দের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উন্মেষার্থ প্রতিষ্ঠিত। জিজ্ঞাসুগণ সভা হইতে শিক্ষণীয় বিষয় শিখিবে ও সভায় বলিবে এবং সেই সূত্রে স্ব স্ব চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বাক্‌শক্তির উন্নতি সাধন করিবে। আধুনিক অধিবেশনে সভা স্বীয় আদর্শস্থানীয়তা রক্ষা করিতে না পারিলেও পথভ্রষ্ট হইয়া যে গণ্ডীর বাহিরে যায় নাই, ইহা অবশ্য আনন্দের বিষয়। নানা লোকের নানাবিধ সমালোচনা ও স্ব স্ব রুচিসঙ্গত নানা রকম ব্যাখ্যা দেখিয়া হয়ত অনেকে বলিতে পারেন, এতাদৃশ সন্দেহ পরম্পরায় বিশ্বাসের ব্যাঘাৎ জন্মাইয়াছে—অনেকে সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান হইতেছেন। আমাদের মতে তাহা নহে। এরূপ বলিলে স্বীয় আন্তরিক দুর্ব্বলতা ও অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেওয়া হয়। সহিষ্ণু জিজ্ঞাসু সর্ব্বাগ্রে সন্দেহ বা সংশয় অপেক্ষা করে। নির্ণয় সংশয়-সাপেক্ষ।

সংশয় না থাকিলে নির্ণয় হইবে কাহার? প্রয়োজন থাকিলে প্রবৃত্তি হয়, আর প্রবৃত্ত হইয়া পদে পদে সন্দিগ্ধ হইলে পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। তদনন্তর অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। বৈয়াসিক ন্যায়মালা সর্ব্বাদৌ বলিয়াছেন ও কার্য্যতঃ করিয়াছেন যে—

"একো বিষয়সন্দেহ পূর্ব্বপক্ষাবভাসকঃ।
শ্লোকোঽপরস্তু সিদ্ধান্তবাদী সঙ্গতয়ঃ স্ফুটাঃ॥

এক একটী অধিকরণ পঞ্চাবয়ব যথা—বিষয়, সন্দেহ, সঙ্গতি, পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত। শঙ্করাচার্য্য, ব্যাসদেবকৃত সূত্রনিচয়ের প্রাঞ্জল ভাষ্য লিখিয়া থাকিলেও ব্যাসাধিকরণমালা গ্রন্থে বৈয়াসিক ন্যায়মালা-রচয়িতা পঞ্চাবয়ব প্রদর্শনে অধিকরণগুলিকে আরও প্রাঞ্জলতর করিয়া পাঠার্থীর যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। রচয়িতার নাম জানিতে পারা যায় নাই, পরন্তু অজ্ঞাতনামা নিঃস্বার্থপর সেই মহাত্মা আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পবিত্রস্থল সন্দেহ নাই। তিনি দুই দুইটী শ্লোকে এক একটি অধিকরণের সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রত্যেক অধিকরণে সঙ্গতি না দেখাইলেও অথবা দেখান আবশ্যক মনে না করিলেও বিষয়, সন্দেহ, পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদের ধর্ম্মসভায় ধর্ম্মতত্ত্বরূপ বিষয়টীর সন্দেহ মাত্র উল্লিখিত বা আলোচিত হইয়াছে, পূর্ব্বপক্ষ পর্য্যন্ত যায় নাই, সুতরাং সিদ্ধান্তান্বেষী ব্যক্তি যদি তাহাতে বিরক্তি বা ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া

থাকেন, তাহা হইলে সে তাঁহার অসহিষ্ণুতা বা ধৈর্য্যচ্যুতি বলিতে হইবে। হয়ত কেহ ভাবিতে বা বলিতে পারেন, ধর্ম্ম-তত্ত্ব বিষয়ে ওরূপ সন্দেহ বা পূর্ব্বপক্ষ সঙ্গত নহে। তদ্দ্বারা অনাস্থা আসিয়া ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদের সহায়তা করে। আমরা বলি সিদ্ধান্তান্বেষী ব্যক্তি ত একথা বলিতেই পারেন না, সাধারণে বলিলেও হাস্য সম্বরণ করা যায় না। এ সভা বা কোন্ ছার বা ইহার আলোচ্য ধর্ম্মতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক সন্দেহ বা কোন্ ছার, হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, নিত্য ও অব্যয়। বৌদ্ধগণের যুক্তিজালে—কৌশলজালে এমন কি প্রজ্জ্বলিত বিশাল অগ্নিকুণ্ডেও যাহা ভস্মীভূত হয় নাই, ম্লেচ্ছ যবনকুলের শাণিত করবাল সংঘর্ষে যাহা খণ্ডিত হয় নাই, অসহিষ্ণু অসূয়াবশবর্ত্তীর দল বিবিধ উপায়ে যাহার অনুমাত্র অন্যথাভাব করিতে পারে নাই, কয়েকটা নগণ্য ব্যক্তির নগণ্য সন্দেহে তাহা বিকৃত বা বিপর্য্যস্ত হইবে, ইহা চিন্তা করা বিষম ভুল নহে কি? আমাদের মতে ধর্ম্মতত্ত্বের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে সন্দেহ চাই, পূর্ব্বপক্ষ চাই, তবেই ত অগ্নিপরীক্ষিত হইবে ও অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের বিমল জ্যোতিঃ সন্দেহ-কালিমাবিহীন পরিষ্কৃত অন্তঃকরণে পবিত্র ধর্ম্মভাবের আনন্দময় স্ফুরণ করাইবে। তখন ধর্ম্মপিপাসাসু মানব, হিন্দু ধর্ম্মের মৌলিকতা ও সনাতনতা অনুভব করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গাহিবে—

"দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং চারুরূপং
ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি ন পুনঃ চন্দনং চারু গন্ধং

ছিন্নং ছিন্নং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিক্ষুদণ্ডং
প্রাণান্তেঽপি প্রকৃতি বিকৃতির্জায়তে নোত্তমানাং।”

কাঞ্চন শতবার দগ্ধ হইলেও তাহার মনোহর রূপ পরিত্যাগ করে না, চন্দন সহস্রবার ঘৃষ্ট হইলেও মনোহর গন্ধ পরিত্যাগ করে না; ইক্ষুদণ্ড শতধা চিন্নবিচ্ছিন্ন হইলেও স্বীয় স্বাদুতা পরিত্যাগ করেনা; যাহা উত্তম যাহা মৌলিক প্রাণান্তেও তাহার বিকৃতি হয় না।

হিন্দুধর্ম্ম অন্যকর্তৃক উপহসিত, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত, আক্রান্ত—যাহা হইতে পারে হউক কিন্তু বিপর্য্যস্ত হইবে না, হয় নাই বা হইতেই পারে না। স্বয়ং ভগবান তাহার রক্ষক ইহা নিঃসন্দেহ। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—

“ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে”

সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা ভগবানের অনবাপ্ত বা অবাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি তিনি ধর্ম্মরক্ষার্থ সংসারী হইবেন, ইহা ধর্ম্মের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। স্বয়ং বিধাতা পুরুষ যাহার প্রহরী, তাহার অন্যথা শঙ্কা করা অল্পজ্ঞতা বা অজ্ঞতার পরিচায়ক। অনেকে অনেক প্রকারে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আপাতমধুর পরধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, কিন্তু সে মধুরিমা বেশিদিন ভোগ করিতে সমর্থ হন নাই। কেহ বা উদ্দাম ভাব অবলম্বনে বেজায় মাধুর্য্য ভোগ করিয়া আধিব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন, কাহারও বা মাধুর্য্যে মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইচ্ছা হইতেছে, স্বধর্ম্ম অম্লরসে মুখটা ছাড়াইবেন, কিন্তু

হায়! স্বধর্ম্ম অম্লরস হাতছাড়া হইয়া পড়িয়াছে। না মধুর পরধর্ম্ম রুচিতেছে, না স্বধর্ম্ম অম্লরস আর হস্তগত হইতেছে। ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় "কাশী বা মক্কা বা" করিতেছেন। এতাদৃশ যথেচ্ছাচার-সম্প্রদায়ের ঈদৃশ ব্যাপারে আর কিছুই হউক বা না হউক, স্বধর্ম্মের মৌলিকতা ও সনাতনতা এবং ধর্ম্মান্তরের আগন্তুকতা ও আপাতমধুরতা প্রতিপন্ন হইতেছে। পলান্ন বা খেচরান্ন আপাততঃ উপাদেয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা মৌলিক বা অবিমিশ্র হইতে পারেনা। একমাত্র অবিমিশ্র বিশুদ্ধ অন্নই পথ্য। প্ররোচনায় পড়িয়া জঙ্গলি ধাঙ্গড়গুলা সপরিবারে কুলি হইয়া আসামে যায়। যাইবার সময় আহা! তাহাদের কি উৎসাহ। পুত্র, পিতাকে না বলিয়া, কন্যা, স্নেহময়ী জননীর স্নেহ ভুলিয়া—এমন কি স্নেহের পুতুল কোলের ছেলেকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া কত গোপনে কত সন্তর্পণে আত্ম-বিক্রয় করে। কিন্তু হায়! গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখে যে সর্ব্বত্র সেই সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্র। বরং তাহাদের প্রিয়তম গন্তব্যস্থানটী স্বার্থের অচিন্তনীয় লীলাক্ষেত্র ও পিশাচের মর্ম্মস্পর্শী তাণ্ডবে ভীষণ হইতে ভীষণতর। যত উৎপীড়িত হইতে থাকে, ক্রমে স্বদেশ, স্বজন ও স্বজাতির কথা মনে করিয়া আকুল হইয়া পড়ে। কিন্তু তখন আর উপায় নাই—নির্গতিক। অনুতাপের তীব্র উষ্মা অন্তরকে জর্জ্জর করিয়া থাকে। হা হতোঽস্মি! বলিয়া স্বদেশের দিকে তাকায়, কিন্তু হায়! সে যে অনেক দূরে চোখ পাইবার নহে। প্ররোচনার বশবর্ত্তী হইয়া পরধর্ম্মগ্রাহী

অনেকের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ কি না চিন্তাশীল বিজ্ঞমণ্ডলী তাহা বিবেচনা করিবেন। এত করিয়াও অসূয়িসম্প্রদায় যে সনাতন ধর্ম্মের অণুমাত্র অন্যথা করিতে পারে নাই, আজ কি না এই সব সভার কয়েকটী নগণ্য সন্দেহে সেই সনাতন ধর্ম্ম বিকৃত হইবে! ইহা যে উপহাসের কথা। সনাতন ধর্ম্মটীকে বিপর্য্যস্ত করিবার উদ্দেশে ভারতে কত জায়গায় কত ডিপোর প্রতিষ্ঠা না হইয়াছে। কত সুচতুর পণ্ডিতগণ আড়কাটীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, কত ধাঙ্গড়কে ভুলাইয়া কুলি চালান দিতেছেন। কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের সনাতনতা ও মৌলিকতা নষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি? যে সনাতন, সে সনাতনই আছে ও থাকিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা অজ্ঞতার পরিচায়ক।

ভূমিকাটা বাড়িয়া গেল, শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হইতে পারে। ক্ষমা করিবেন। এই প্রবন্ধে ধর্ম্ম সম্বন্ধেই অল্পাধিক আলোচনা হইবে। এই ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা বহুস্থলে হইয়া থাকায় উপস্থিত প্রবন্ধটীর "ধর্ম্মতত্ত্ব-পরিশিষ্ট" নাম দিয়া সভ্যগণের সম্মুখে পাঠার্থ দণ্ডায়মান হইয়াছি। প্রবন্ধের সারবত্তা প্রদর্শন করিয়া যশোলাভে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই। সভায় সন্দিগ্ধ ব্যক্তিবৃন্দের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ বদ্ধপরিকর হই নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ ও স্বীয় হিন্দুত্বকে স্মরণ করিয়া আমি আমার কর্ত্তব্য প্রতিপালনে বাধ্য হইয়াছি। মনু বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মোবিদ্ধস্ত্বধর্ম্মেন সভাং যত্রোপতিষ্ঠতে
শল্যঞ্চাস্য ন কৃন্তন্তি বিদ্ধাস্তত্র সভাসদঃ।

সভায় অধর্ম্ম কর্ত্তৃক ধর্ম্মবিদ্ধ হইলে যদি সভ্যগণ শল্যস্বরূপ অধর্ম্মকে সদ্বিচারের দ্বারা উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে সভাসদ্ সকলেই অধর্ম্ম শল্যে বিদ্ধ হন।

আবার বলিয়াছেন—

"সভাং বা ন প্রবেষ্টব্যং বা সমঞ্জসং
অব্রুবন্ বিব্রুবন্ বাঽপি নরো ভবতি কিল্বিষী।"

বরং সভাতে যাইবেনা, গেলে কিন্তু সত্যই বলিবে। তথায় মৌনাবলম্বন করিলে বা মিথ্যা কহিলে পাপী হইতে হয়। সভায় সন্দেহকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় নীরব থাকা গর্হিত বিবেচনায় কিছু বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। আমি আমার নিজের কিছু লইয়া দণ্ডায়মান হই নাই, মহাত্মাগণের ধর্ম্মোপদেশের সারাংশ মাত্র সঙ্কলন করিয়া, সভায় সমুপস্থিত করিলাম, সভ্যগণ ভুলভ্রান্তি সংশোধন করিয়া, সারাংশের সারাংশ গ্রহণ করুন, ইহাই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

সামান্য বা গুরুতর কোনও বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হইলে, প্রায় অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন, এই অনুবন্ধ চারিটীর আবশ্যকতা উপলব্ধ হয়। যে বিষয়ের অনুষ্ঠান করা হইবে, তাহার যদি কেহ অধিকারী না থাকে, তাহা হইলে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইবে কেন? আবার অনুষ্ঠিত বিষয়ের সহিত সেই অধিকারীর যদি কোনও সম্বন্ধ থাকে, তবেই অনুষ্ঠান সার্থক হইবে। নিরর্থক্ কার্য্যে প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির স্বেচ্ছায় প্রবৃত্তি হয়না। সামান্য একজন সূত্রধরের কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ

করুন। সূত্রধর (ছুতোর) জীবিকা নির্ব্বাহার্থ কাঠের বিবিধ প্রকারের ব্যবহারোপযোগী পদার্থ প্রস্তুত করে। প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে সে গ্রাহক বা অধিকারী নিশ্চয় করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। বাবুগণ চেয়ার, টেবেল, ছড়ি, গাড়ী নিশ্চিতই খরিদ করিবেন, ইহা সে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছে। তাই তাহার প্রবৃত্তি হইয়াছে। আবার প্রস্তুত করা জিনিসগুলির সহিত বাবুগণের একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে বলিয়াই বাবুগণকে প্রকৃত অধিকারী বলিয়া নির্ব্বাচিত করিয়া, সূত্রধর কার্য্যে নিঃসন্দেহ প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সামান্য সূত্রধরের কার্য্যেও সেই চারিটী অনুবন্ধ বর্ত্তমান। সভ্য বাবুগণ "অধিকারী" চেয়ার, টেবেল আদি "বিষয়"—গ্রাহ্য গ্রাহক "সম্বন্ধ" ও জীবনোপায় "প্রয়োজন"। আমাদের আজ-কার আলোচ্য ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়েও এই চারিটী অনুবন্ধ যে অত্যাবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রকৃত ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিই ইহার অধিকারী। ধর্ম্মতত্ত্বটা বিষয়। প্রতিপাল্য প্রতিপালক বা সেব্য সেবক সম্বন্ধ। মুক্তি পর্য্যন্ত ইহার প্রয়োজন। ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে স্বয়ং দেবী পার্ব্বতী, পিতা হিমাচলকে জ্ঞানোপদেশ দিবার সময় বলিয়াছেন—

জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তির্ভক্তির্জ্ঞানস্য কারণং।
ধর্ম্মাৎ সংজায়তে ভক্তির্ধর্ম্মোযজ্ঞাদিকো মতঃ॥

জ্ঞান হইতে মুক্তি। ভক্তি হইতে জ্ঞান। ধর্ম্ম হইতে ভক্তি

এবং যজ্ঞাদি কর্ম্মই ধর্ম্ম। কি জ্ঞানযোগ, কি ভক্তিযোগ, কি কর্ম্মযোগ সর্ব্বত্র ধর্ম্মের সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় প্রয়োজনীয়তা। ধর্ম্মাচরণের দ্বারা মানব প্রকৃতিস্থ হয়। প্রকৃতিস্থ হইলেই নিজের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারে। এইখানে আর একটী কথা বলা আবশ্যক মনে করি যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথিত প্রাচীন একটী বাক্য আছে যে—

"বেদাবিভিন্নাঃ স্মৃতয়োবিভিন্নাঃ নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

বেদ সমস্ত বিভিন্ন বিভিন্ন। স্মৃতি সমস্তও বিভিন্ন। তিনিই মুনিই নহেন, যাঁহার মত ভিন্ন নহে। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মতত্ত্ব গুহায় নিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ জটিল হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং মহাজনগণ যে পথে চলিতেছেন বা চলিয়াছেন, তাহাই পথ। তাহাই ধর্ত্তব্য।

কথাটী শুনিলে আপাততঃ এই বোধ হয় যে, বেদে ও স্মৃতিতে নানা প্রকারের নানামত সন্নিবেশিত হইয়াছে। যখন যে মুনি হইয়াছেন, তখনই তিনি একটা ভিন্ন মত সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। মুনির সংখ্যা নাই, মতেরও সংখ্যা নাই। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মতত্ত্বটী জটিল হইয়া পড়িয়াছে। মত-মতান্তর আলোচনা না করিয়া শিষ্টব্যক্তিগণ যে পথে চলিয়া গিয়াছেন, সেই পথেই চলা উচিত। পরন্তু কথাটী যে সে লোকের কথা নহে, স্বয়ং ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠিরের উক্তি। দুঃখের বিষয় আজ কাল এই উক্তির সুদূরবর্ত্তী লক্ষ্যের দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই।

উক্তিটীকে অন্ধ বিশ্বাসের সূত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। আমাদের মনে হয়, বক্তা প্রবৃত্তিপরান্মুখ কুতর্কী ও সন্দিগ্ধ ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের আপাত প্রবৃত্তির জন্যই "শিষ্টাচার" ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন এবং "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।" তিনি মুনি নহেন যাঁহার মত ভিন্ন নয়, এ কথাটীর প্রকৃত অর্থ বা ভাবার্থ বোধ হয় এই হওয়া সঙ্গত মনে হয় যে, যিনি ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের ধর্ম্মজিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিবার কোনও একটী উপায় করিয়া দিয়া যান নাই, তিনি মুনি নহেন। কোনও মুনির লক্ষ্য ভিন্ন নহে, আবিষ্কৃত পথই ভিন্ন ভিন্ন। এতদ্দ্বারা তাঁহারা জগতের নৈসর্গিক হিতৈষণার পরিচয় দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় অধুনাতন অনেকে মনে করেন যেন মুনিগুলা পরস্পরে ঝগড়া ঝাটী করিয়া নিজ নিজ বাহাদুরী ফলাইবার জন্য যাহার যাহা ইচ্ছা এক একটা পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। বেদ সংহিতা পুরাণ স্মৃতি আদি সর্ব্বজনাদরণীয় গ্রন্থবেত্তা ও গ্রন্থকর্ত্তাগণ এরূপ গুলিখোরী করিয়া গিয়াছেন, ইহা শুনিলে যেরূপ হাস্যের উদ্রেক হয়, বলিতেও তদ্রূপ লজ্জা বোধ করে। পথের নানাত্ব দেখিয়া পথকর্ত্তার লক্ষ্য ভেদ স্থির করা সঙ্গত মনে করি না। এ সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত দেখুন।

পতিতপাবনী গঙ্গা সাগর-সঙ্গমে চলিয়াছেন। পথে কত কোটি জীব গঙ্গাজল স্পর্শে সদ্গতি লাভ করিতেছে। গঙ্গা-স্নানাভিলাষীগণের সুবিধার জন্য কত জায়গায় কত পুণ্যাত্মা এক একটী ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিয়া স্নানার্থীগণের অশেষ সুবিধা

করিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা কাশী, কলিকাতা প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রধান প্রধান নগরগুলিতে গিয়াছেন, তাঁহারাই সে ঘাটের বাহুল্য ও স্নানার্থীগণের অহমহমিকাপূর্ণ স্নানেচ্ছা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তত্তৎ নগরবাসী এমন পুণ্যাত্মা বড়লোক নাই, যিনি সাধারণের হিতার্থ একটা ঘাট প্রস্তুত করিয়া যান নাই। তাই মিত্রের ঘাট, বসুর ঘাট, রাজা বাবুর ঘাট, অমুক মারওয়াড়ীর ঘাট ইত্যাদি অসংখ্য ঘাটই আছে। আমাদের ধর্ম্মতত্ত্বও সেই পতিত-পাবনী গঙ্গারস্রোতঃ। ইহাতে ভাসিতে পারিলে ইহার প্রবাহও গঙ্গার ন্যায় সচ্চিদানন্দ-সাগরে পঁহুছিয়া দিবে। গঙ্গার ঘাটের ন্যায় ইহারও অসংখ্য মত বা পথ, গঙ্গার ঘাট-আবিষ্কর্ত্তার ন্যায় ইহারও মত-আবিষ্কর্ত্তা অসংখ্য। গঙ্গাতীরবাসী এমন বড়লোক নাই, যিনি শক্তি অনুসারে আলাহিদা একটা ঘাট করিয়া দেন নাই। ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও তদ্রূপ "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।" তিনি মুনিই নন যিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী মত করিরা যান নাই। ঘাট আবিষ্কর্ত্তাদের মধ্যে যেমন পরস্পর জিগীষা বা অসূয়ার কারণ নাই, জীবের উপকার একমাত্র লক্ষ্য, তদ্রূপ ধর্ম্মসম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন মতের আবিষ্কর্ত্তাগণের পরস্পরে বিরোধ নাই। জগতের হিতৈষণাই একমাত্র লক্ষ্য। ঘাটের বাহুল্য দেখিয়া যদি কেহ এটায় যাইব না, সেটায় যাইব, কোন্ ঘাটটা ভাল? ওটা পিচ্ছিল নাকি, ইত্যাদি বিবিধ সন্দেহ ও তর্ক করিয়া অনর্থক কালক্ষেপ করেন, তাঁহার পক্ষে নিরপেক্ষ ব্যক্তির এই উক্তি বোধ হয় শ্রেয়স্কর হইতে পারে যে, মহাশয়েরা বৃথা কেন

এটা সেটা করিয়া কালক্ষেপ করিতেছেন ? এত স্নানার্থী যে ঘাট দিয়া স্নান করিয়া যাইতেছে আপনিও সেই পথে নামিয়া স্নান করুন না ? কোন্টা ভাল কোন্টা মন্দ এরূপ বিচারে ফল কি? ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠিরও যেন এই শ্রেণীর সন্দিহান ব্যক্তির জন্য বলিয়াছেন—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

শ্রৌত ও স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্দেহাকুল ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসুর ত্বরা প্রবৃত্তির জন্য শিষ্টাচার ধর্ম্মটীরই কেবল উপদেশ দিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, শ্রুতি স্মৃতি আদির মতান্তর দেখিয়া যখন সদাচারে চলিবারও উপদেশ আছে, তখন আর বৃথা ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনায় ফল কি? বিড়ম্বনা মাত্র। একথা আপাত সত্য বা মনোরম হইলেও এতদ্দারা আন্তরিক দুর্ব্বলতার পরিচয় দেওয়া হয়। বিশেষতঃ সর্ব্ব ধর্ম্মের ক্রমাবনতির সহিত সদাচারবিশিষ্ট ব্যক্তির অবনতি যেরূপ ঘটিয়াছে, তাহাতে আদর্শ অন্বেষণ করিয়া হতাশ হওয়া অপেক্ষা আদর্শস্থানীয় মহাজনগণের আচরিত সদাচার সমষ্টি যাহা শ্রৌত স্মার্ত্তগণ আমাদের মত সংকীর্ণ বুদ্ধি মানবগণের জন্য লিপি-বদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা শ্রেয়স্কর মনে করি। বিশেষতঃ মুনিগণের মত মতান্তরকে উপলক্ষ্য করিয়া যাহা—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" বলা হইয়াছে, তাহা সম্ভবতঃ ব্যষ্টি বা বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মকেই লক্ষ্য করিতেছি। সমষ্টি বা সামান্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে ধার্ম্মিক সাধারণের মতানৈক্য দেখা যায় না। যেমন

মনে করুন, শৈব্য শাক্ত গাণপত্য বৈষ্ণব ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন উপাসকগণ স্বীয় অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রণোদিত হইয়া স্ব স্ব উপাস্য দেবতার প্রাধান্য প্রখ্যাপনার্থ পরস্পরে বাদানুবাদ করিতে পারেন, কিন্তু সকলের উপাসনার মধ্যে সেই এক শৌচ-সদাচারাদি, সাধারণ ধর্ম্মরূপে অঙ্গীকৃত ও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মত মতান্তর বিবেক-দৃষ্টির নিকট স্থান পাইবার নহে। অতএব অনভিজ্ঞ বা অচিন্তাশীল ধর্ম্মজিজ্ঞাসুর প্রবৃত্তির উন্মেষ করাইবার ব্যপদেশেই যেন বলা হইয়াছে—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" ভগবান নিজেও বলিয়াছেন—"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং।" ভক্তগণও বলেন—"আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরং সর্ব্বদেব নমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি।"

চিন্তা করিয়া দেখুন না কেন, কি গাণপত্য, কি শৈব, কি বৈষ্ণব সকলেই এক একটী উপাস্য স্থির করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন সত্য কিন্তু গণপতি, শিব, বিষ্ণু এই কয়টী ধাতু প্রত্যয়-ঘটিত শব্দগুলি বাদ দিয়া সমষ্টি দৃষ্টিতে দেখিলে সকলেই দেবভক্ত ছাড়া অপর কেহই নহে। ভক্তি একমাত্র সকলের লক্ষ্য। একটী দৃষ্টান্ত আছে—

কয়েকজন জন্ম-অন্ধ একদিন একটী হাতীর কেহ বা পায়ে, কেহ বা উদরে, কেহ বা শুঁড়ে, কেহ বা মাথায়, কেহ বা লেজে ধরিয়া পরস্পর তর্ক আরম্ভ করিল। যে পায়ে ধরিয়াছে, সে বলিল, ভাই আমি হাতী ধরিয়াছি, হাতীটা ঠিক থামের মত।

যে পেটে ধরিয়াছে, সে রাগে বলিল, সে কি ? আমিই ঠিক হাতী ধরিয়াছি, হাতীটা ত মস্ত একটা জালার মত। যে শুঁড়ে ধরিয়াছিল, সে তর্ক করিয়া বলিল হাতীটা বড় সাপের মত। যে মাথায় ধরিয়াছিল, সে বলিল, মৃৎকুম্ভের মত। যে লেজে ধরিয়াছিল, সে বলিল, ঝাড়ুদারের ঝাঁটার মত। শ্রোতৃবর্গ বিবেচনা করুন সকলে সেই এক হাতী ধরিয়াছে কি না ? এবং কল্পিত নাম গুলি বাদ দিয়া অন্ধগণ কর্ত্তৃক ধৃত অংশ গুলির সমষ্টি হাতী কি না ? তাই বলিতেছিলাম ব্যষ্টি দৃষ্টিতে মত মতান্তর এবং ব্যষ্টি দৃষ্টির কলহেই ধর্ম্ম গুহান্বিত হইয়া "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" এই বাক্যকে অবসর দিয়া থাকে। অন্ধগণের হস্তী স্বরূপ নির্ব্বাচন কলহে যেরূপ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির অনাস্থা স্বাভাবিক, ব্যষ্টি ধর্ম্মের কলহে সনাতন ধর্ম্মজিজ্ঞাসুর অচাঞ্চল্যও সেইরূপ স্বাভাবিক। মুনি ভিন্ন হইতে পারেন, মত ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের লক্ষ্য ভিন্ন নহে--এক। অত্যন্ত পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আজকাল সেরূপ ধর্ম্মজিজ্ঞাসু বা ধর্ম্মোপদেষ্টা অতি বিরল। শিক্ষিত সম্প্রদায় ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার প্রকৃত অধিকারী। অধুনা যাঁহারা শিক্ষিতাভিমানী, তাঁহারা বিলাস-পরিপুষ্ট এবং ব্যসন-অপভ্রষ্ট শরীরটীকে কষ্টসাধ্য শৌচ-সদাচারাদি সনাতন ধর্ম্মে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হন না ; অধিকন্তু হিন্দুর ব্যষ্টি ধর্ম্মের প্রতি কটুকটাক্ষ করিতে বিলক্ষণ পাটব প্রদর্শন করেন। পরন্তু প্রকৃত ধর্ম্মজিজ্ঞাসুর ইহাতে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। অন্ধগণের হস্তী ধরা ব্যাপারে

চক্ষুষ্মান্‌ই বলিতে পারিবে যে, অন্ধ সকলেই হাতী স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু অন্য কেহ অন্ধ কি এই অন্ধগণের কলহে মত মতান্তর দেখিয়া হাসিবে না ? অবশ্য হাসিবে। ধর্ম্মাচরণভীরু বা অসমর্থ ব্যক্তি যে, নানা মুনির নানা মত দেখাইয়া একটা গোল পাকাইয়া ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত হইবে, উপহাস করিবে বা বিরত করিবার চেষ্টা করিবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি ? অলস চায় সংসার অলস হইলে তাহার আলস্য দোষটা নিরাপদ হয়। ফল কথা সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু মাত্রেই একমত।

অতঃপর সনাতন ধর্ম্ম ও তাহার ক্রমাবির্ভাব বলিব। গরুড় পুরাণে উক্ত আছে,—

"শ্রুত্যুক্তঃ পরমোধর্ম্মঃ স্মৃতিশাস্ত্রগতোঽপরঃ
শিষ্টাচারেণ শিষ্টানাং ত্রয়ো ধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।"

শ্রুত্যুক্ত অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম্ম প্রধানতম, স্মার্ত্ত ধর্ম্ম প্রধানতর এবং শিষ্টাচার প্রধান। এই ত্রিবিধ ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম।

ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্দে উক্ত আছে,

"ক্ষীণায়ুষঃ ক্ষীণসত্ত্বান্ দুর্ম্মেধান্ বীক্ষ্য কালতঃ।
বেদান্ ব্রহ্মর্ষয়ো ব্যস্যন্ হৃদিস্থাচ্যুতচোদিতা ॥৪২॥৬অ
অস্মিন্নপ্যন্তরে ব্রহ্মন্ ভগবান লোকভাবনঃ।
ব্রহ্মেশাদ্যৈর্লোকপালৈর্যাচিতো ধর্ম্ম গুপ্তয়ে ॥৪৩॥৬অ
পরাশরাৎ সত্যবত্যামংশাংশ কলয়া বিভুঃ।
অবতীর্ণো মহাভাগঃ বেদং চক্রে চতুর্ব্বিধং ॥৪৪॥৬অ

ঋগথর্ব্ব যজুঃ সাম্নাং রাশীনুদ্ধৃত্য বর্গশঃ।
চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রেমন্ত্রৈর্মণিগণা ইব ॥৪৫॥৬অ
তাসাং স চতুরঃ শিষ্যানুপাহূয় মহামতিঃ।
একৈকাং সংহিতাং ব্রহ্মমেকৈকস্মৈ দদৌ বিভুঃ ॥৪৬॥৬অ
পৈলায় সংহিতামাদ্যাং বহ্বৃচাখ্যামুবাচ হ।
বৈশম্পায়ন সংজ্ঞায় নিগদাখ্যাং যজুর্গণং ॥৪৭॥৬অ
সাম্নাং জৈমিনয়ে প্রাহ তথা ছন্দোগ সংহিতাং।
অথর্ব্বাঙ্গিরসীং নাম স্বশিষ্যায় সুমন্তবে ॥৪৮॥৬অ

কালসহকারে লোক সকলকে ক্ষীণায়ু, দুর্ব্বুদ্ধি ও হীনবল দেখিয়া মহর্ষিগণ হৃদিস্থিত অন্তর্যামিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া দ্বাপর যুগের শেষভাগে বেদ সকলকে ক্রমশঃ বিভক্ত করিলেন।

হে ব্রহ্মন্! এই সময়ে ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মাদি লোকপাল কর্ত্তৃক ধর্ম্মরক্ষার্থ প্রার্থিত হইয়া, ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ পরাশর হইতে সত্যবতীর গর্ভে অংশকলারূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। এবং সামান্য মণির খনি হইতে পদ্মরাগাদি মণি উদ্ধারের ন্যায় ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব রাশি হইতে বর্গক্রমে মন্ত্র সকল উদ্ধার করিয়া সেই সকল মন্ত্রেতে চারিটী সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। পরে মহামতি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন চারিজন শিষ্যকে আহ্বান করিয়া এক একজনকে এক এক সংহিতা প্রদান করিলেন। প্রথমতঃ বহ্বৃচ নামক ঋক্ বেদ সংহিতা, পৈলকে শিক্ষা দিলেন। পরে নিগদাখ্য যজুর্ব্বেদ সংহিতা বৈশম্পায়নকে উপদেশ করিলেন। ছান্দোগ নামক

সামবেদ সংহিতা জৈমিনিকে কহিলেন এবং আঙ্গীরসী নামধেয় অথর্ব্ব সংহিতা সুমন্তকে অধ্যয়ন করাইলেন।

স্থূলতঃ এই সংহিতা যুগ পর্য্যন্ত শ্রৌত বা বৈদিক ধর্ম্মের বহুলপ্রচার অণুমিত হয়। ক্রমে মানবগণকে ক্ষীণায়ু দুর্ব্বুদ্ধি ও হীনবল দেখিয়া করুণানিলয় ব্যাস বাদরায়ণ বেদগত জটিলত্ব অপনোদনার্থ বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেও সেই প্রত্যেক ভাগ বৈদিক কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এই তিন তিন কাণ্ডে বিভক্ত। মহামুনি জৈমিনী কর্ম্মিগণের জন্য কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদভাগ ও জৈমিনির গুরু বেদবিভাগকর্ত্তা বাদরায়ণ ব্যাস জ্ঞানিগণের জন্য উৎকৃষ্ট মীমাংসা প্রণয়ন করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। জৈমিনি কৃত কর্ম্মরহস্য পূর্ব্ব মীমাংসা ও ব্যাসকৃত তত্ত্বজ্ঞানরহস্য উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত নামে অভিহিত। আমাদের আলোচ্য—ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত ব্যাস কৃত মীমাংসার পারম্পরিক সম্বন্ধ থাকিলেও জৈমিনি মুনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসার সহিত ইহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ।

জৈমিনি দর্শনের প্রথম সূত্রই হইতেছে—"অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা।"

জৈমিনি অভিপ্রায় যে—"নহিকশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্ম্মকৃৎ।" অকর্ম্মা হইয়া যখন কেহ ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারে না, তখন জীবনিবহের জন্য কর্ম্মমার্গ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া উচিৎ। তাহা হইলে কর্ম্মী জীবনিচয় ধর্ম্মসাধক নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া বিমলচিত্ত হইবে ও সদ্গতি লাভ

করিবে। জৈমিনি এক প্রকার স্বীয় গুরু বাদরায়ণ ব্যাসের প্রবর্ত্তিত উত্তরমীমাংসার অধিকারী প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন।

কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের তেজ তিমিরের ন্যায় বিরোধ অঙ্গীকৃত হইলেও এবং তন্নিবন্ধন কর্ম্মী জ্ঞানীকে "চিনি হওয়া ভাল নয়। চিনির স্বাদ গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হওয়া উচিৎ।" এই বলিয়া কটাক্ষ করিলেও এবং জ্ঞানী কর্ম্মীকে "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত-লোকে বিশন্তি" পুণ্য ক্ষীণ হইলে আবার মর্ত্তলোকে ফিরিতে হইবে এই বলিয়া—"ধর্ম্মকর্ম্মৈক লভ্য" স্বর্গাদির ক্ষয়াদি দোষ কীর্ত্তন করিয়া শুনাইলেও জৈমিনি কৃত কর্ম্মকাণ্ডের সহিত ব্যাস প্রবর্ত্তিত জ্ঞানকাণ্ডের যে একটা দুশ্ছেদ্য পূর্ব্বাপরীভাব বর্ত্তমান্ রহিয়াছে, তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। বিমল দর্পণেই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে। কর্ম্ম শাস্ত্রীর ধর্ম্মাচরণে চিত্ত নির্ম্মল হইলেই জ্ঞানকাণ্ডের তত্ত্বজ্ঞান স্ফুরিত হইবে। কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞান কাণ্ডের সোপান। ষড়দর্শনের টীকাকার জ্ঞানভাণ্ডার বাচস্পতি মিশ্র বেদান্ত দর্শনের—৩য় অধ্যায়ের ৪র্থ পাদে ২৬ সূত্র—

সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদি শ্রুতেরশ্ববৎ।"

এই সূত্রের ভাষ্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে—তথাহি আশ্রম-বিহিতনিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানাৎ ধর্ম্ম সমুৎপাদঃ ততঃ পাপ্মা বিলীয়তে। স হি তত্ত্বতোঽনিত্যাশুচি দুঃখানাত্মনি সংসারে সতি। নিত্য শুচি সুখাদি লক্ষণেন বিভ্রমেন মলিনয়তি চিত্তসত্ত্বং অধর্ম্ম নিবন্ধনত্বাৎ বিভ্রমাণাং অতঃ পাপ্মনঃ প্রক্ষায় প্রত্যক্ষোপপত্তি দ্বারা পাবরণে সতি প্রত্যক্ষোপপত্তিভ্যাং সংসারস্য তাত্ত্বিকী অনিত্য-

শুচিদুঃখরূপতাং অপ্রত্যুহং বিনিশ্চিনোতি। ততো অস্মিন্ অনভিপ্রীতিসঙ্গং বৈরাগ্যমুপজায়তে ততস্তাজ্জিহাসা অস্য উপাবর্ত্ততে ততো হানোপায়ং পর্য্যেষতে। পর্য্যেষমানশ্চ আত্মতত্ত্বজ্ঞান-মস্যোপায় ইতি শাস্ত্রাৎ আচার্য্য বচনাচ্চ উপশ্রুত্য তজ্জিজ্ঞাসতে।

স্ব স্ব আশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য ধর্ম্ম অর্থাৎ শুভাদৃষ্টের উৎপত্তি, তন্নিবন্ধন পাপের ক্ষয় হয়। এই পাপ বা অধর্ম্ম অনিত্য অপবিত্র ও দুঃখজনক সংসারক্ষেত্রে নিত্য পবিত্র সুখাদি রূপ পরিণাম দেখাইয়া মানবের অন্তঃকরণকে কলঙ্কিত করে। সাংসারিক সুখ বা দুঃখ সকলের মূলেই অধর্ম্ম নিহিত আছে, পরন্তু কোথাও বা তাহা প্রকট আর কোথাও বা প্রচ্ছন্ন। পাপ ক্ষয় হইলেই নির্ম্মল মন, প্রত্যক্ষ জ্ঞান তর্কাদিতে সমধিক সমর্থ হয়; সুতরাং সে সংসারের স্বরূপ অবগত হইয়া তাহাতে বিরক্ত হয় এবং তাহাকে ত্যাগ করিতে অভিলাষী হয়। পরে ত্যাগের উপায় অন্বেষণ করতঃ শাস্ত্র বা সদ্‌গুরুর নিকটে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের উপায় অবলম্বন করিয়া তদ্বিষয়ে যত্নশীল হয়।

এতদ্দ্বারা সহজে বুঝা যায় যে জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ডকে পরিত্যাগ করে না। দুঃখের বিষয় অধুনাতন অভূতপূর্ব্ব জ্ঞান-কাণ্ডীগণ রাতারাতি "অহং ব্রহ্মাস্মি—একমেবাদ্বিতীয়ং" হইয়া যান। কর্ম্মকাণ্ডের "ক"কারের সহিত সম্বন্ধ নাই অথচ তাঁহারা বিমলচিত্ত। বিলাসের ক্রোড়ে বসিয়াও একবার হাঁটু গাড়িয়া চোখ বুজিলেই সমাহিত। উদরের বেলায় একমেবাদ্বিতীয়ং। আব্রহ্ম-স্তম্ভ পর্য্যন্ত এক জ্ঞানে উদরসাৎ করিয়া ফেলেন। আদরের

বেলায় কিন্তু স্ত্রী, কন্যা, মাতা, ভগিনী জ্ঞান পূর্ণ থাকে। যাক বাজে লোকের বাজে আলোচনায় লাভ নাই।

যাঁহারা কর্ম্ম ও জ্ঞানের পারম্পর্য্য ভাব না বুঝিয়া মিথ্যা হট্টগোল করেন তাঁহাদিগকে বলি যে জৈমিনি ও ব্যাস—শিষ্য ও গুরু। তাঁহারা আবার আজকালকার গুরু শিষ্য নহেন। তাঁহাদের উক্তিগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ হইবে ইহা যে ভাবাই ভুল। অন্য কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িলাম ক্ষমা করিবেন। অতঃপর ধর্ম্মতত্ত্বের কয়েকটী স্তর দেখাইবার জন্য চেষ্টা করিব। প্রথমে বেদের কথাই বলা উচিত মনে করি। পরে দর্শনের কথা বলিব। বেদের সিদ্ধান্ত এই যে "ধর্ম্মঞ্চর"—"ধর্ম্মেণ সুখমাসাৎ" অর্থাৎ ধর্ম্ম আচরণ কর, ধর্ম্মের দ্বারাই সুখ হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে ধর্ম্মে সুখ লাভ হইয়া থাকে, সে ধর্ম্ম কি? বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা কণাদ বলিতেছেন,—

"যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ"।

অর্থাৎ যাহা দ্বারা লৌকিক সুখ এবং নিঃশ্রেয় সাধিত হয় তাহাই ধর্ম্ম। নিঃশ্রেয় সম্বন্ধে দর্শনকর্ত্তারা প্রায় অনেকে লিখিয়াছেন যে প্রবৃত্তির নাশ হইলে জন্ম নাশ হয়। জন্ম নাশ হইলে তাবৎ দুঃখই নষ্ট হয়। দুঃখ নাশ হইলে অপবর্গ লাভ হয়। এই অপবর্গের অন্যতম নামই নিঃশ্রেয়ঃ এবং এই নিঃশ্রেয়ঃ সিদ্ধিই ধর্ম্ম। মহামুনি কণাদের বাক্যানুসারে এই নিঃশ্রেয় প্রাপ্তি বা অপবর্গ লাভই ধর্ম্ম সাধনের পরম পুরুষার্থ। এই প্রকার ন্যায়দর্শনকার মহর্ষি গৌতম স্থির করিয়াছেন যে,

তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই ধর্ম্মলাভ হয়। তাঁহার মতে তত্ত্বজ্ঞান হইতে মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হয়। মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলে, নিখিল দোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং দোষ নষ্ট হইলে সকল প্রকার দুঃখের শান্তি হইয়া থাকে। এই দুঃখ শান্তির নাম পুরুষার্থ। পুরুষার্থ ই অন্যতম ধর্ম্ম।

সাংখ্যদর্শনকার সিদ্ধশিরোমণি কপিল দেবের সিদ্ধান্তানুসারে স্থূলতঃ দেখা যায় প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগানুসারে সৃষ্টি হইয়াছে। এই সৃষ্টি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে বিভক্ত। এই সকল তত্ত্ব হইতে অতীত হইতে পারিলেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। এই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই পরম ধর্ম্ম। ব্যাস শিষ্য জৈমিনিরও মত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যায়। চিত্ত শুদ্ধ হইলেই যে সদা সন্নিহিত আত্মচৈতন্যের তাহাতে প্রকাশ পাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

যে দর্শনগুলির স্থূল স্থূল মত উদ্ধৃত করা হইল, মেধাবীগণ প্রণিহিত হইয়া চিন্তা করিলে বিলক্ষণ ধারণা করিতে পারিবেন যে, এই পাঁচখানি দর্শনের যাহা সাধনফল, তাহাই ভগবান বাদরায়ণ ব্যাসদেব-প্রবর্ত্তিত বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত ও প্রায়শঃ তদতিরিক্ত নহে। বেদান্তও ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ স্থির করিয়া মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও পূর্ব্ব মীমাংসার একমাত্র লক্ষ্য সেই আলোচ্য সনাতন ধর্ম্মকে সর্ব্বপ্রথমে স্থান দিয়াছেন। সনাতন ধর্ম্মের দার্শনিক স্তর দেখান হইল। সনাতন ধর্ম্ম অন্যান্য

নানা ধর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত স্বরূপ নহে। অন্যান্য ধর্ম্ম সমূহে কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কিছু কিছু নিয়ম এবং সামাজিক অল্পাধিক কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালনের কথা উল্লিখিত আছে, কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের বিচারে ধর্ম্মাধর্ম্মের অতিরিক্ত পদার্থ ইহসংসারে কিছুই নাই। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীরা স্নানে, ভোজনে, শয়নে, জাগরণে, উপবেশনে, উত্থানে, কথনে, শ্রবণে ইত্যাদি প্রত্যেক কর্ম্মে সনাতন ধর্ম্মের বিরাট স্বরূপ পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং অধর্ম্মের ভীষণ বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করেন। অধর্ম্ম প্রাকৃতিক নিয়ম নষ্ট করিয়া তাঁহাদের উৎসাহ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে দেখিলে, তাঁহারা ধর্ম্মের সাহায্যে তাহা হইতে রক্ষা পান। ধর্ম্মের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—"নিয়ম।" ধাতুগত অর্থ—"ধারণ করে যে।" এই উভয় অর্থ হইতে তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিলে স্থূলতঃ বলা যাইতে পারে যে, যে নিয়ম এই সৃষ্টি-ক্রিয়াকে ধারণ বা সংরক্ষণ করিয়া আছে, তাহাই ধর্ম্ম। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা উচিত কোন্ নিয়ম সৃষ্টি-ক্রিয়াকে সংরক্ষণ করিতেছে এবং সেই নিয়ম কোন্ অবস্থায় ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হয় এবং কি অবস্থায় উপনীত হইলে অধর্ম্ম বলিয়া বিঘোষিত হইয়া থাকে?

ভগবান বলিয়াছেন,—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং।"

প্রকৃতি জগৎকর্ত্রী। সেই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণময়ী বলিয়া সৃষ্টি-ক্রিয়াও ত্রিগুণাত্মিকা। রজোগুণে উৎপত্তি, সত্ত্বগুণে স্থিতি ও তমোগুণে লয় হয়।

বেদান্তপরিভাষা বলেন -

"স চ পরমেশ্বর একোঽপি স্বোপাধিভূত মায়ানিষ্ট সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ ভেদেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেঁশ্বরাদি শব্দবাচ্যতাং ভজতে।

তথা সৃজ্যমান প্রাণি কর্ম্মবশেন পরমেশ্বরোপাধিভূত মায়ায়া বৃত্তি বিশেষা ইদমিদানীং স্রষ্টব্যং ইদমিদানীং পাপয়িতব্যমিদ মিদানীং সংহর্ত্তব্যমিত্যাকারা জায়ন্তে।"

এক পরমেশ্বর স্বীয় উপাধিভূত মায়ার বৃত্তি বিশেষ বিশেষা-বিছিন্ন হইয়া রজঃগুণপ্রাধান্যে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, সত্ত্বগুণপ্রাধান্যে বিষ্ণু পালয়িতা ও তমোগুণপ্রাধান্যে রুদ্র নাম গ্রহণ করিয়া সংহারকর্ত্তা হইয়া থাকেন, অতএব ফলকথা রজোগুণে উৎপত্তি, সত্ত্বগুণে স্থিতি ও তমোগুণে লয়। বিশ্বসংসার এই তিন গুণের লীলাক্ষেত্র। এমন কোন সাংসারিক পদার্থ নাই, যাহা সৃষ্টি স্থিতি লয় এই তিন অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে বা হইয়াছে; ব্রহ্মাণ্ডের অগণিত গ্রহ সমূহ হইতে সামান্য তৃণটী পর্য্যন্ত এই অবস্থার অধীন। এই প্রকার জীবপ্রবাহও যে এই নিয়মের অধীন তাহা বলাই বাহুল্য। অহংতত্ত্বের দ্বারা জীব বিমোহিত হইয়া ধর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে প্রবাহিত হয়। পুনরায় ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের উত্তাল উর্ম্মীমালার আলোড়নে সৃষ্টির মধ্যে ভাসিতে থাকে। এক আবর্ত্ত হইতে গিয়া আবর্ত্তান্তরে ডুবিতে থাকে। এক জন্মের পর আবার জন্ম লাভ করিতে থাকে। যেমন নদীগর্ভে পতিত কীট একটী আবর্ত্ত হইতে অন্য আবর্ত্তে অন্য আবর্ত্ত হইতে অপর আবর্ত্তে গিয়া আবর্ত্ত পরম্পরায় জর্জ্জর হইতে থাকে,

তদ্রূপ সৃষ্টি-প্রবাহে ভাসমান জীবও জন্ম পরম্পরায় জর্জ্জর হইতে থাকে। নদীর আবর্ত্তে পতিত কীটকে যেমন কোন কৃপালু ব্যক্তি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া যদি তীরে তুলিয়া দেন, তাহা হইলে সে কীট যেমন তীরস্থ তরুর ছায়ায় গিয়া বিশ্রাম লাভ করিয়া, ক্লেশ-পারাবার হইতে রক্ষা পায়, তদ্রূপ জন্মাবর্ত্ত প্রপীড়িত সৃষ্টিসাগরে ভাসমান জীবনিবহ পরমকারুণিক গুরুর সাহায্যে আত্মজ্ঞানরূপী অবিনশ্বর তরুর শান্তিচ্ছায়ায় বিশ্রান্ত হইয়া, সাংসারিক ক্লেশপরম্পরা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। এই তিন অবস্থা জীবের স্বাভাবিক। তাহাই ধর্ম্ম, যাহা এই ক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মে বাধা না জন্মায়। এবং তাহাই অধর্ম্ম যাহা এই স্বাভাবিক নিয়মে বাধা প্রদান করিয়া থাকে।

স্মৃতি বলেন—

"ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতো ননু হতো হন্তি ধ্রুবং প্রাণিনো
হন্তব্যো ন ততঃ স এব শরণং সংসারিণাং সর্ব্বথা।"

ধর্ম্ম রক্ষিত হইলে রক্ষা করেন, হত হইলে অর্থাৎ ধর্ম্ম রক্ষা না করিলে, ধর্ম্ম হত হইয়া, প্রাণীগণকেও হত করেন। অতএব ধর্ম্ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য। সংসারিগণের ধর্ম্মই এক-মাত্র শরণ।

এই পদ্যোল্লিখিত ধর্ম্মটী একমাত্র সেই সনাতন ধর্ম্মের সমষ্টি স্বরূপকেই লক্ষ্য করিতেছে। সংসারী বলিতে কেবল এক দেশবাসী বা এক ধর্ম্মাবলম্বী কোনও একটী সম্প্রদায়কে বুঝায় না; অবশ্য একটী বিরাট্ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিতেছে

সুতরাং এস্থলে ধর্ম্মের সমষ্টি স্বরূপকে গ্রহণ না করিলে সমন্বয় হয় না। তাই বলিতেছিলাম গুণময়ী প্রকৃতি-সৃষ্ট ত্রিগুণাত্মক সৃষ্টি কার্য্যের রক্ষক বা অবাধে পরিচালকই ধর্ম্ম, এবং তদিতর অধর্ম্ম। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"কার্য্যতেহ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ"

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের দ্বারা পরিচালিত হইয়া জীব অবশভাবে হয়, অন্তরে অন্তরে না হয় বাহিরে কোন না কোন কার্য্য অবশ্য করিবে। কার্য্য করিয়া জীব যে কর্ম্ম সঞ্চিত করিবে, তাহাই ভাবি-জন্মে প্রারব্ধরূপে পুনরায় সেই জীবকে ব্যাপৃত করিবেই করিবে। সেই প্রারব্ধ কর্ম্মই ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়া অপর কিছু নহে। আবার সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রণোদিত হইয়া যে কার্য্য করিবে, তাহাও ধর্ম্মরূপে ও অধর্ম্মরূপে প্রারব্ধ কোটিতে পরিগণিত হইবে। সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মই জীবের স্বভাব বা সৃষ্টির স্বভাব।

জীব কর্ম্মাধীন হইলেও তাহার স্বাতন্ত্র্য একেবারে নাই বলা সঙ্গত নহে। তাহা হইলে বিধি-নিষেধ-ঘটিত ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠে। বিশেষতঃ সকলেই কর্ম্মের দোহাই দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন, সুতরাং কর্ম্মের অধীনতার মধ্যে জীবের যে স্বাতন্ত্র্যটুকু আছে, তাহাই আমাদের আলোচ্য ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনার ভিত্তি।

জীব, সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে পড়িবার পর ক্রমশঃ আপনার গুণোন্নতি দ্বারা উন্নত হইয়া শেষে বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপে যাইবে

ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম; কেন যাইবে? সে "কেনর" উত্তর সহজ নহে। বিশেষতঃ পাঠ্যমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনাও সঙ্গত নহে। তবে এই মাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, কর্ম্মদোষে মহারাজ পদবীচ্যুত ব্যক্তি যখন দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে জর্জ্জরিত হইবেন, তখন যে তিনি ক্ষমতা সত্ত্বেও পুনরায় সেই সুখময় রাজপদবী লাভের আকাঙ্খা না করিবেন বা তদর্থে যত্ন না করিবেন, ইহা কি কখনও স্বাভাবিক নিয়ম হইতে পারে? সন্তপ্ত জীবের স্বরূপাবস্থা লাভেচ্ছা স্বাভাবিক। জীবের এই স্বাভাবিক উন্নীনীষার সহায় বা অনুকূল কার্য্যকলাপই ধর্ম্ম। প্রতিকূল কার্য্যকলাপই অধর্ম্ম। সত্ত্বগুণোন্মেষিত প্রবৃত্তিই ধর্ম্মের অনুকূল। রজঃ ও তমোগুণোন্মেষিত প্রবৃত্তিই প্রতিকূল। রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য যে সময়, অবস্থা, দেশ ও পাত্র বিশেষে ধর্ম্ম নয় তাহা বলিতেছি না। কারণ আপদ্ধর্ম্ম বলিয়া যে ধর্ম্মের একটী ব্যষ্টিস্বরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশে সত্ত্ব-প্রধান বলিতে পারিনা। মনে করুন গৃহস্থাশ্রমী যদি আশ্রমোচিত কার্য্য অর্থাৎ যাহাতে রজঃপ্রধান কৃত্যগুলি কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্ধারিত আছে, তাহা না করিয়া রাতারাতি ব্রহ্মজ্ঞানী সাজিয়া বসে, তাহা কি তাহার পক্ষে ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? অথবা বলিষ্ঠ হিংস্রক ষাঁড় কর্ত্তৃক সাংঘাতিক ভাবে আক্রান্ত হইয়া, তৎকালে অগত্যা প্রতিহিংসা করিয়া স্বীয় প্রাণরক্ষা করিলে, সেই প্রতিহিংসা তমোগুণোদ্দীপ্ত বলিয়া অধর্ম্ম হইবে কি?

তাই বলিতেছিলাম সত্ত্বগুণোপেত ধর্ম্ম বিশুদ্ধ হইলেও দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থা বিশেষে রজঃ ও তমোগুণের কার্য্যও অধর্ম্ম নহে। গুণময়ী সৃষ্টি-ক্রিয়ার প্রবাহ চালাইবার জন্য গুণ ত্রিতয়েরই আবশ্যকতা। যাহাই হউক সনাতন ধর্ম্মের ব্যষ্টিস্বরূপ দেখাইবার সময় সে সমস্ত গুণাগুণের বিশেষভাবে আলোচনা করা যাইবে। সম্প্রতি সৃষ্টিস্থিতিকারক সত্ত্বগুণোন্মেষিত ধর্ম্মের কথাই বলা সঙ্গত বিবেচনা করি। সমষ্টি দৃষ্টিতে সনাতন ধর্ম্ম রক্ষক একমাত্র সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি। এই সাত্ত্বিক প্রবৃত্তিই অন্যতম সনাতন ধর্ম্ম এবং ইহার বিরোধী যাহা তাহাই অধর্ম্ম। কাম, ক্রোধ, অসূয়া, দম্ভ ইত্যাদি তামসিক বৃত্তিগুলি জীবের স্বাভাবিক উন্নিনীষার বিরোধী, অতএব ইহারা অধর্ম্ম এবং বৈরাগ্য ক্ষান্তি ঔদার্য্য ইত্যাদি তাহার অনুকূল বলিয়া ইহারা ধর্ম্ম। কেবল ইহা যে জীবের জীবত্ব নষ্ট করিয়া ব্রহ্মরূপে অবস্থান করাইবার জন্য ধর্ম্ম নাম গ্রহণ করিয়াছে তাহা নহে। ধর্ম্ম সুবিশাল জগৎকে ধারণ করিয়াছে বা রক্ষা করিতেছে বলিয়াই ধর্ম্ম।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, স্থপতিবিদ্যা, আলেখ্য-বিদ্যা, সঙ্গীত, দেশাচার, দিগ্বিজয়, ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদি চিন্তাযোগ্য বিষয় মাত্রেই ধর্ম্মের রক্ষণ-শীলতা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ব্যষ্টি ধর্ম্ম আলোচনার সময় ইহার প্রত্যেকটীতে ধর্ম্মের ওতপ্রোতভাব দেখাইবার বাসনা রহিল।

আজ কেবল সনাতন ধর্ম্মের সমষ্টি স্বরূপই দেখান হইবে।

ধর্ম্মই মানবকে সংসারের অশেষ বিপদরাশির মধ্যে সুখের পথ প্রদর্শন করে। ভবসাগরে ধর্ম্মই মানবকে পোত-প্রদীপ স্বরূপ সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া প্রবল ঝটিকান্দোলিত উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্য দিয়া তীরস্থ করে।

জগতে মানব ব্যষ্টিভাবে দুর্ব্বল অসহায় হইলেও সমষ্টিভাবে প্রভূত শক্তির আধার। মানব সমাজবদ্ধ হইয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা জাতীয় সাধনার গুণে স্বকীয় শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নশীল। যে জাতীয় সাধনার গুণে মানব এ জগতে অন্য প্রাণী অপেক্ষা এত উন্নত, ধর্ম্মই সে সাধনার জীবাতু।

মানব সমাজবদ্ধ হওয়া অবধি পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া লোকালয়ে বসবাস করে। অসংখ্য ভিন্ন পরিবার লইয়া এক এক সমাজ গঠিত হয়। সামাজিক অসংখ্য সম্বন্ধ নিরূপণ করতঃ সমাজকে সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করা ধর্ম্মের এক মহৎ কর্ত্তব্য। এই কারণে বোধ হয় পুরাকাল হইতে ধর্ম্ম, সকল দেশে বিবাহাদি সংস্কারগুলি স্বহস্তে পরিচালিত করে এবং সমাজের পারিবারিক গঠন পদ্ধতি অটুট রাখিবার জন্য সর্ব্বত্র নানাবিধ অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম বা রীতি নীতির ব্যবস্থা করে।

মানবের এই বাহ্যিক প্রাকৃত ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া অন্তরের ব্যাপার দেখিলে সেখানেও ধর্ম্মের রক্ষণশীলতা মূর্ত্তিমতী। স্থূলতঃ বলা যাইতে পারে যে, তিন প্রকার প্রবৃত্তি লইয়া মানবের মন গঠিত। স্বার্থ প্রবৃত্তি, পরার্থ-প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। ইহাদের মধ্যে স্বার্থ-প্রবৃত্তি নিকৃষ্ট অর্থাৎ মানবের রিপু। পরার্থ

প্রবৃত্তিগুলি উৎকৃষ্ট; উহাই ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি। স্বার্থ-প্রবৃত্তি না হইলে সংসার চলেনা সত্য, কিন্তু তাহা অযথা চরিতার্থ হইলে তাহাতে কি সমাজ, কি পরিবার, কি সম্বন্ধ সর্ব্বত্র অমঙ্গলের আশঙ্কা হয়। পরার্থ-প্রবৃত্তিগুলি যথাভাবে কৃতকার্য্য হইলে সমাজের প্রভূত মঙ্গল হয়। স্বার্থ ও পরার্থ প্রবৃত্তির অবিশ্রান্ত সংঘর্ষ চলিয়াছে। এই ভয়াবহ সংঘর্ষে ধর্ম্মই একমাত্র মধ্যস্থ করিতেছেন। তাহা না হইলে এ সাংঘাতিক বিগ্রহ দাবাগ্নির ন্যায় সমস্ত অরণ্যকে ভস্মস্তূপ করিয়া দিত—সৃষ্টি লোপ পাইত। ধর্ম্ম, সমাজের উপযোগিতা অনুসারে স্বার্থ-প্রবৃত্তিগুলি দমিত করিয়া অর্থাৎ উহাদের অযথা চরিতার্থতা নিবারণ করিয়া পরার্থ-প্রবৃত্তিগুলির সম্যক্ স্ফুর্ত্তি করায় তখন বুদ্ধিবৃত্তিও তাহাতে সামঞ্জস্য সুধা মাখাইয়া দেয়; তদ্দারা জনসমাজ শ্রীসম্পন্ন, সুখী ও সমৃদ্ধ হয়। যাঁহারা জন্মান্তর স্বীকার করেন না, তাঁহারা যাহা বলিতে বা ভাবিতে পারেন পারুন। আমাদের হিন্দু প্রধান ধর্ম্মসভার সভ্যগণ এরূপ মনে না করেন যে, ধর্ম্ম কেবল সমাজ পরিচালন বা পারিবারিক নিয়ম সংরক্ষণ ইত্যাদি ঐহিক কৃত্যকলাপেই সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে।

আমাদের এই সনাতন ধর্ম্ম মৃত্যুর পরেও আত্মার অনুগমন করে। হিন্দুগণ বলেন—

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"

শরীরের সহিত সমস্ত বিনষ্ট হয়, কিন্তু একমাত্র সুহৃৎ

ধর্ম্মই সঙ্গে যায়। যাঁহাদের বিচার-শক্তি ইহজীবনেই সীমাবদ্ধ, তাঁহারা এ সম্বন্ধে যাহাই বলুন, তাঁহাদের মত সর্ব্বদা ঐক-দেহিক।

হিন্দুর আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি যেরূপ তাহাতে ধর্ম্মই আমাদের প্রধান অবলম্বন। ইহাই আমাদিগকে অনন্তকাল ধারণ করিয়া আছে ও করিবে।

অবশ্য আমি নিন্দা করিতেছি না, কিন্তু এই জন্যই বলিতে ইচ্ছা হয় যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য দীক্ষায় আমরা ধর্ম্মের অতি সঙ্কুচিত স্বরূপ নিশ্চয় করিয়া থাকি। সে শিক্ষা ও দীক্ষা আমাদের সনাতন ধর্ম্মের বিরাট্ স্বরূপ দেখাইতে সমর্থ নহে। তাহা জ্ঞানকরী হইতে পারে, কিন্তু সে স্থূল জড়পদার্থের জ্ঞান। আমাদের সনাতন ধর্ম্ম এই জড়বিজ্ঞানের সীমায় আবদ্ধ নহে। সনাতন ধর্ম্ম, স্থূল জড়বিজ্ঞানের যেরূপ অজেয় সম্রাট্, সূক্ষ্ম অধ্যাত্মবিজ্ঞানেরও সেইরূপ রাজচক্রবর্ত্তী।

দুঃখের বিষয় আজকাল স্থূল জড়তত্ত্বের জ্ঞানোন্নতির সহিত সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্ব ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় এ সম্বন্ধে বেশ একটী দৃষ্টান্ত দেন। তিনি বলেন, অন্তঃকরণের স্থূল ও সূক্ষ্ম চিন্তা করা যেন দুইটী অঙ্গ। সম্প্রতি অন্তঃকরণের স্থূল বিষয় চিন্তা করা এত প্রবল হইয়া পড়িয়াছে যে, সূক্ষ্ম চিন্তা একবারে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। অন্তঃকরণ এখন যেন ঠিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী। এক অঙ্গ অন্তঃকরণের পুষ্ট, অন্য অঙ্গ নষ্টপ্রায়। বাস্তবিক সম্প্রতি

জড়-তত্ত্বেরই যুগ। অধ্যাত্ম-তত্ত্ব একটা কথার কথা হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয় অধুনা ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী অনেক মহাপুরুষ জড়বিজ্ঞানের রাজ্যে গিয়া অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের বিমল মধুরিমা দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জড়-বিজ্ঞানীগণের অন্তঃকরণের (সূক্ষ্মতত্ত্ব বিচাররূপ) লুপ্তপ্রায় অঙ্গ ক্রমে যেন পুনরঙ্কুরিত হইবে এরূপ আশা করা যাইতেছে। দুঃখের বিষয় স্বদেশের অন্তঃকরণ যেই অসাড় সেই অসাড়ই আছে। ভগবানই জানেন এ পক্ষাঘাত সারিবে কি না? এই দুরারোগ্য ব্যাধির ঔষধ একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম। সনাতন ধর্ম্মাব-লম্বীর হৃদয় জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করিবার জন্য সতত উন্মুখ। তাহাদের এই আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও ধর্ম্ম কর্ত্তৃক সংরক্ষিত।

যে জীবাত্মা পরব্রহ্ম হইতে বিচ্যুত প্রায় হইয়া ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার দ্বারা কিছুদিনের জন্য জড়দেহে নিবদ্ধ, যে জীবাত্মা যুগধর্ম্মানুসারে ক্রমশঃ কলুষিত ও অধঃপতিত হয়, সেই জীবাত্মার আধ্যাত্মিকতা স্ফুর্ত্তির জন্য ধর্ম্মই প্রধান সহায়। জীবাত্মা সংসারী হইয়া কর্ম্মানুসারে শরীর, মন ও ইন্দ্রিয় ইত্যাদির সহিত সম্বদ্ধ হয়। তন্নিবন্ধন অশেষ সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া থাকে। কর্ম্মফলানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোকে কত শত বার পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে থাকে। সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির স্ফুর্ত্তির দ্বারা এই জীবাত্মার কর্ম্মসূত্র ছিন্ন করিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ করিতে একমাত্র ধর্ম্মই প্রধান সহায়। অতএব

আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বারা জীবাত্মার স্বরূপাবস্থান করাইয়া দেওয়া সনাতন ধর্ম্মের একটী চরম প্রয়োজন।

এই আধ্যাত্মিকতার স্ফুর্ত্তির দ্বারা মানব মনের উৎকর্ষ সাধন সনাতন ধর্ম্মের ২য় প্রয়োজন। এই মানসিক উৎকর্ষই সমাজ ও পরিবারকে রক্ষা করিতেছে। সমাজ রক্ষা করিতে হইলে, পরিবার প্রতিপোষণ করিতে হইলে, ভক্তি প্রেম দয়া দাক্ষিণ্য ইত্যাদি যে কয়েকটী উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির আবশ্যকতা তৎসমস্ত সেই সনাতন ধর্ম্মের এক একটী বিকাশ।

মানব-মনের স্বভাবতঃ বলবতী নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলির দমন সনাতন ধর্ম্মের ৩য় প্রয়োজন। এই সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দমনের জন্য সনাতন ধর্ম্ম যেরূপ সংযমপ্রধান ক্রিয়াযোগের উপদেশ দেয়, অন্য কোনও ধর্ম্ম এতটা সমর্থ কি না শ্রোতৃমণ্ডলী তাহার বিবেচনা করিবেন।

স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ সনাতন ধর্ম্মের ৪র্থ প্রয়োজন। ধর্ম্মব্রতোপবাসাদি দ্বারা স্বাস্থ্যের পন্থা যেরূপ নিরাপদ করে, যম নিয়ম ধ্যান ধারণা সমাধি ইত্যাদি যোগমার্গের উপদেশ দিয়া দীর্ঘজীবন লাভের পথও পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। আমার ত মনে হয় হিন্দুর ধর্ম্ম ক্রিয়াযোগ বিষয়ে উচ্চাসন পাইবার যোগ্য। অন্য ধর্ম্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মাত্র উপলব্ধি করিয়া তদুদ্দেশ্যে গুটিকতক স্তুতিব্যঞ্জক শব্দ ব্যবহার বা আড়ম্বরপূর্ণ দয়া দাক্ষিণ্যাদির কথা কহিয়া ধর্ম্মের উপসংহার করা হয়, কিন্তু হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম, সংযম প্রধান ক্রিয়াযোগের দ্বারা ধর্ম্মপিপাসুর হৃদয়

ধর্ম্মময় করিয়া দেয়; যাহা বলে, কার্য্যতঃ তাহা প্রতিপন্ন করাইয়া ধর্ম্মের মূল সুদৃঢ় করে। বাস্তবিক মৌখিক শিক্ষা বা মৌখিক বলা অপেক্ষা কার্য্যতঃ যাহা করা যায়, তাহাই প্রকৃত চেষ্টার ফল। প্রথম পাঠারম্ভ কালে বর্ণমালাগুলি লিখিয়া লিখিয়া শিখিয়াছি বলিয়া আজীবন "ক খ গ ঘ" ইত্যাদি হৃদয়ে খোদিত হইয়া আছে। এইখানে পুণ্যাত্মা যোগী রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপদেশগুলি মনে আসে। একদিন, এক শিষ্য পরমহংস দেবকে জিজ্ঞাসা করে, "গুরো! ঈশ্বরের উদ্দেশে এত স্তব স্তুতি করা সত্ত্বেও ঈশ্বর প্রসন্ন হন না কেন? ধর্ম্ম শাস্ত্রাদির এত পাঠ—এত আলোচনা করা সত্ত্বেও ঈশ্বরের দর্শন লাভ ঘটে না কেন?" পরমহংস দেব বলিলেন, "বাবা মুখে বলিলে কার্য্য হয় না, কার্য্যতঃ তাহা করিতে হয়। ভাঙ্গ ও আফিমে নেশা আছে সত্য কিন্তু ভাঙ্গ ভাঙ্গ বা আফিম আফিম বলিয়া চীৎকার করিলে ত নেশা হয় না; তাহা খাইলে নেশা হয়। পাঁজিতে কত আঢ়ক জলের কথা লেখা থাকে কিন্তু পাঁজি ঝাড়াঝাড়ি করিলে কুশাগ্র বিন্দুও পড়ে না কেন?" তাই বলিতেছিলাম কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া চীৎকার করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না বা ধর্ম্মগ্রন্থের পাতা উল্টাইয়া কর্ত্তব্য শেষ করিলে ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় না। হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম তাই ক্রিয়াযোগের সুব্যবস্থা দিয়াছেন। অতএব ইহা, অসাধারণতার অধীশ্বর হইবার যোগ্য কি না শ্রোতৃমণ্ডলী তাহার বিবেচনা করিবেন।

পরাৎপর ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া অতিশয়

চিন্তাপরায়ণ হইয়াছিলেন। তিনি চিন্তা করিলে তাঁহার দক্ষিণাঙ্গ হইতে শ্বেতকুণ্ডলধারী এবং শ্বেতমাল্য-অনুলেপনাদিযুক্ত একটী পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইল। ব্রহ্মা তাহাকে দেখিয়া কহিলেন তুমি চতুষ্পাদ বৃষাকৃতি। তুমি জ্যেষ্ঠ হইয়া প্রজাপালন কর। এই বলিয়া স্থির হইলেন। সেই ধর্ম্ম সত্যযুগে চতুষ্পাদ, ত্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ, এবং কলিতে একপাদ দ্বারা প্রজাদিগকে পালন করেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষত্রিয়দিগকে তিন ভাগে বৈশ্যদিগকে দ্বিভাগে এবং শূদ্রদিগকে এক ভাগ দ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন। গুণ দ্রব্য ক্রিয়া ও জাতি এই চারিটী পাদ। তিনি বেদে ত্রিশৃঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, তাঁহার আদ্যন্ত ওঁকার, দুইটী শিরা এবং সপ্ত হস্ত।

ব্রহ্মার হৃদয় দেশ হইতে ধর্ম্ম এবং পৃষ্ঠ দেশ হইতে অধর্ম্মের উৎপত্তি। শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ আচারের নাম অধর্ম্ম। এই অধর্ম্মও ব্রহ্মার একটী পুত্র বিশেষ। মিথ্যা তাঁহার ভার্য্যা; এই মিথ্যার গর্ভে দম্ভ (পরপ্রতারণা) নামে এক পুত্র এবং মায়া (পর প্রতারণার উপযোগী চেষ্টা) নামে এক কন্যা জন্মে। দম্ভ ও মায়া উভয়ে স্ত্রী পুরুষ হয়। দম্ভ মায়ার উদরে লোভ নামে এক পুত্র এবং শঠতা নামে এক কন্যা উৎপাদন করে। তাহাদিগের হইতে ক্রোধ এবং হিংসা উৎপন্ন হয়। কলি সেই ক্রোধ ও হিংসার পুত্র। দুরুক্তি কলির সহোদরা। কলি ঐ দুরুক্তির গর্ভে ভীতি নামে এক কন্যা এবং মৃত্যু নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। তাহাদিগের হইতে যাতনা ও নরক

উৎপন্ন হয়। এইরূপে সংক্ষেপে অধর্ম্মের বংশ কীর্ত্তিত হইল। এই অধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিলেই মনুষ্যের পুণ্য সঞ্চয় হয়। (ভাগবতপুরাণ ৪—৮ অধ্যায়।)

ধর্ম্মাধর্ম্মের সুখ-দুঃখ সাধকত্ব বিষয়ে জৈমিনি সূত্রে কথিত আছে যে—কো ধর্ম্মো যো ভূপ্যেয়ায়। কোঽধর্ম্মো যো ন ভূপ্যেয়ায়। অর্থাৎ ধর্ম্ম কি? যাহা সুখের নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। অধর্ম্ম কি? যাহা দুঃখের নিমিত্ত উৎপন্ন হয়।

(১) ধারণ করেন এই অর্থে ধর্ম্ম নাম হইয়াছে। ধর্ম্ম দ্বারা সমস্ত প্রজা ধৃত হইয়া থাকে, যে হেতু একমাত্র ধর্ম্মই এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ত্রিলোকীকে ধারণ করেন।

(২) বেদাদি শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াজন্য পুরুষের যে গুণ তাহাই ধর্ম্ম। আর বেদাদি শাস্ত্র-নিষিদ্ধ ক্রিয়াজন্য পুরুষের যে গুণ তাহাই অধর্ম্ম।

(৩) বেদ ও পুরাণ শাস্ত্রবিহিত যে কর্ম্ম তাহা মানবগণের ইষ্টদায়ক। তদ্বিরুদ্ধ যে কর্ম্ম, তাহা তাহাদিগের অনিষ্টদায়ক।

(৪) যাগ, যজ্ঞ, ব্রতাদির অনুষ্ঠান, সদাচার, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা, দান ও বেদাধ্যয়ন এ সকল কার্য্যের নাম ধর্ম্ম; আর যোগাবলম্বন (চিত্তের বাহ্য বৃত্তি নিরোধ করতঃ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ) দ্বারা আত্মদর্শনের নাম পরম ধর্ম্ম।

---

(১) বাঃ রামাঃ ৬।৬১।৭
(২) স্মৃতি।
(৩) স্মৃতি।
(৪) যাজ্ঞবল্ক্য সং।

(৫) ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা (অপকারীর প্রত্যপকার না করা), দম (বিষয় সংসর্গেও মনের অবিকার অথবা শীতা-তপাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা), অস্তেয় (অচৌর্য্য বা পরধন হরণ না করা), শৌচ (মৃদ্বারি দ্বারা যথা শাস্ত্র দেহ শোধন), ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ (রূপ রসাদি পঞ্চ বিষয় হইতে চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ), ধী (শাস্ত্রাদি তত্ত্বজ্ঞান), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য (যথার্থ কথন), এবং অক্রোধ (ক্রোধের কারণ সত্ত্বেও ক্রোধ সংবরণ করা) ধর্ম্মের এই দশবিধ লক্ষণ জানিবে।

(৬) অদত্ত দ্রব্যের অনুপাদান (অগ্রহণ), দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, বিদ্যা, বিত্ত, তপঃ, প্রভাব, কুলে জন্ম, অরোগ এবং সংসার বন্ধনের উচ্ছেদের হেতু ধর্ম্ম হইতেই প্রবৃত্ত হয়। ধর্ম্ম হইতে সুখ ও জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় এবং জ্ঞান হইতে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।

(৭) সত্যযুগে সকল ধর্ম্মই চতুষ্পাদ বিশিষ্ট ছিল। মনুষ্যগণের সত্য বাক্য ছিল এবং অধর্ম্ম দ্বারা অর্থাগম ছিল না। বাস্তবিক ধর্ম্মের পাদ চতুষ্টয় না থাকিলেও কাল্পনিক পাদ চতুষ্টয়ের দ্বারা তাঁহার সম্পূর্ণত্ব বর্ণনা করা যায়। যেমন লৌকিক ব্যবহার সাধনার্থ ষোড়শপণাত্মক কার্ষাপণের এক চতুর্থাংশকে পাদরূপে কল্পনা করে এবং কার্ষাপণ চতুষ্পাদবিশিষ্ট

---

(৫) মনুসংহিতা।

(৬) গরুড় পুরাণ, ১।২০৬।৯—১০।

(৭) মনুসংহিতা ১।৮১।

এইরূপ লৌকিক প্রতিপত্তি হয়। ধর্ম্মও সেইরূপ চতুষ্পাদ কিন্তু গবাদির ন্যায় চতুষ্পাদ নহেন।

(৮) সত্যযুগে লোকের রোগ ছিলনা এবং সর্ব্ব কামনাই সিদ্ধ হইত এবং চারিশত বৎসর পরমায়ু ছিল, তদনন্তর ত্রেতাদি যুগে এক এক পাদ করিয়া পরমায়ু হ্রাস হইতে লাগিল।

(৯) যে নিয়মানুসারে মানবগণের সত্যযুগে চারিশত, ত্রেতায় তিনশত, দ্বাপরে দুইশত এবং কলিতে একশত বৎসর পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই নিয়ম সৃষ্টির আদি হইতেই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। পরন্তু মনুষ্যের আয়ুর নিমিত্তীভূত কর্ম্ম, দেশ, কাল, ক্রিয়া এবং দ্রব্যের বিশুদ্ধতা ও অবিশুদ্ধতাই পরমায়ুর ন্যূনাতিরেকের কারণ। স্বীয় বিহিত কর্ম্মের হ্রাস হইলেই আয়ুর হ্রাস, বিহিত কর্ম্মের বৃদ্ধি হইলেই আয়ুর বৃদ্ধি ও বিহিত কর্ম্ম সমভাবে থাকিলেই আয়ুও সমতা প্রাপ্ত হয়। বালকগণের মৃত্যুপ্রদ কর্ম্মদ্বারা বালকগণ; যুবকগণের মৃত্যুপ্রদ কর্ম্মদ্বারা যুবকগণ ও বৃদ্ধগণের মৃত্যুপ্রদ কর্ম্মদ্বারা বৃদ্ধগণ মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারী হইয়া স্বধর্ম্মে অবস্থিতি করে, সেই শ্রীমান্ ব্যক্তিই যথাশাস্ত্র পরমায়ু লাভ করিয়া থাকে।

(১০) এই ভারতবর্ষেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই

---

(৮) মনুসংহিতা ১।৮৩।

(৯) যোঃ বাঃ রামায়ণ।

(১০) বিষ্ণুপুরাণ, ২।৩।২৯।২৩

চারিযুগ বিদ্যমান আছে, অন্য কোন বর্ষে এরূপ যুগভেদ নাই। এই বর্ষে যোগীগণ তপস্যা, যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধার্ম্মিকগণ পরলোকের মঙ্গল বিধানার্থ আদরপূর্ব্বক বিবিধ বস্তু দান করিয়া থাকেন। জম্বুদ্বীপের লোকেরা বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যেরূপে যজ্ঞময় সনাতন বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন, অন্যান্য দ্বীপে সেরূপ লক্ষিত হয় না। জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি। অন্যান্য সমুদয় স্থান ভোগভূমি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রাণীগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর অতি কষ্টে বহু পুণ্যে এই স্থানে মানবদেহ প্রাপ্ত হয়।

অতএব আমি আজকার প্রবন্ধে ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মের সমষ্টি স্বরূপ যথাশক্তি চিত্রিত করিলাম, ব্যষ্টিস্বরূপ পরবর্ত্তী প্রবন্ধগুলিতে সময় মত আলোচিত হইবে।

গত অধিবেশনে ধর্ম্মতত্ত্ব-পরিশিষ্ট শীর্ষক প্রবন্ধের যে অংশ পঠিত হইয়াছে, সম্প্রতি তাহার ব্যষ্টি স্বরূপ আলোচিত হইবে। ব্যষ্টি স্বরূপ অঙ্কনের পূর্ব্বে ধর্ম্মের একটী সাধারণ লক্ষণ স্থির করা সঙ্গত মনে করি।

সাধারণে ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া থাকেন—"ধ্রিয়তে যেন স ধর্ম্মঃ।" ইহার স্থূলতঃ অর্থ যে ধারণ করে সেই ধর্ম্ম। বৈষ্ণব মালা ধারণ করেন, বাবু ছড়ি ধারণ করেন, অতএব বৈষ্ণব বা বাবু ধর্ম্ম তাহা নহে। ধর্ম্ম শব্দটী রূঢ়। "গচ্ছতীতি গৌ" যে গমন করে সে গরু, ইহা ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইলেও গমনশীল পদার্থ মাত্র গরু না হইয়া, যেরূপ গল কম্বলাদিবিশিষ্ট

চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ গো শব্দের প্রতিপাদ্য; তদ্রূপ ধারণশীল পদার্থ মাত্র ধর্ম্ম না হইয়া, জগৎরক্ষণসমর্থ সত্ত্বগুণোদ্ভাসিত প্রাকৃতিক নিয়মই ধর্ম্ম।

যাহার অন্যথাভাব হইলে জগদ্বিপ্লুত হয় তাহাই ধর্ম্ম। আমরা ধর্ম্ম বলিতে অনেকগুলি কথা প্রতিপাদ্যের অন্তর্ভূত করিয়া থাকিলেও আপাততঃ শৌচ সদাচারকে ধর্ম্ম বলিয়া বুঝি। একজন হয়ত খুব চিতা ফোঁটা কাটিয়া মুখে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে দেবালয়ে ফিরাফিরী করিতেছেন, তাহা দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা হইল, ইনি ধার্ম্মিক। আর একজন হয়ত শৌচে নাই সদাচারে নাই অথচ চিত্তকে নির্ব্বাত দীপবৎ অকম্পিত রাখিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিতে নিয়োজিত করিয়া জড়বৎ নিশ্চল নিস্তব্ধ। তাহা দেখিয়া স্থির করা হইল ইনি একটি অকর্ম্মা অলস ধর্ম্মাচরণে অসমর্থ পুরুষ। এরূপ সিদ্ধান্ত আজকাল ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্ম শব্দের সঙ্কীর্ণ অর্থ গ্রহণ করায় আজকালকার এই অভিনব সিদ্ধান্ত শিক্ষিত সমাজে স্থান পাইয়াছে। বাস্তবিক বলিতে গেলে ধর্ম্ম শব্দের সেরূপ সংকীর্ণ অর্থ গ্রহণ করিয়া আমরা স্ব স্ব কপোলকল্পিত এক একটি ধর্ম্মে যাহা গোঁড়ামি আরম্ভ করিয়া থাকি তাহাই আমাদের ধর্ম্মবিপ্লবের অন্যতম বিশিষ্ট কারণ। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-বন্দনাদি, ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালনাদি, বৈশ্যের কৃষি-গোরক্ষাদি ও শূদ্রের সেবাদি যেরূপ ধর্ম্ম, জলের শৈত্য, অগ্নির উত্তাপ, পৃথিবীর কাঠিন্যও তদ্রূপ এক একটী ধর্ম্ম। কিন্তু আমরা ব্রাহ্মণের

সন্ধ্যাবন্দনাদিকে ধর্ম্ম বলিয়া থাকি এবং জলের শৈত্যাদিকে স্বভাব বলি। স্বভাব প্রকৃতি বা ধর্ম্ম এই তিনটী প্রায় এক পর্য্যায়।

১। অতীত্যৈব গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে।

২। প্রকৃতির্নৈবমুচ্যতে।

৩। এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।

এই তিনটী পদ্যাংশের ভাবার্থ অনুশীলন করিলে সহজে বুঝা যাইবে যে, স্বভাব, প্রকৃতি বা ধর্ম্ম এই তিনটী শব্দ প্রায় এক পর্য্যায়। ব্যবহারেও দেখা যায় বিপত্তি পতনের পূর্ব্বে যখন লোক ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থাসম্পন্ন হয়, তখনও সাধারণে বলিয়া থাকে যে লোকটার স্বভাব খারাপ হইয়াছে--প্রকৃতি ছাড়া হইয়াছে। তাহা হইলেই দেখুন স্বভাব, প্রকৃতি বা ধর্ম্ম এক প্রতিপাদ্যের অন্তর্ভূত কি না? দার্শনিকগণ জীবের সঞ্চিত কর্ম্ম প্রারব্ধে পরিণত হইলে, তাহাকে কেহ কেহ স্বভাব, কেহ প্রকৃতি, কেহবা ধর্ম্মাধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় ধর্ম্ম বলিতে আমরা কেবল পূজা, পাঠ, দয়া-দাক্ষিণ্য বা শৌচসদাচার ধরিয়া, ভারতীয় হিন্দুধর্ম্মের বিশাল শরীরকে নিতান্ত সঙ্কুচিত করিয়া ফেলি। সমুদ্রকে রত্নাকর না বলিয়া হীরকাকর বলা যেরূপ তাহার খ্যাতির সংকোচক, আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মকেও তদ্রূপ এক একটী নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা তাহার গৌরবের অবরোধক। তবে ব্যষ্টি স্বরূপ আলোচনার সময় তদ্রূপ সঙ্কোচ করা অমঙ্গলজনক নহে। কারণ

সংকীর্ণবুদ্ধি অধিকারী বিশাল সনাতন ধর্ম্মের বিরাট স্বরূপ ধারণা করিতে সমর্থ হইবে না। ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে যাওয়াই প্রাকৃতিক নিয়ম। অতএব ধর্ম্মের ব্যষ্টি স্বরূপ আলোচনার পূর্ব্বে আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, এই ব্যষ্টি স্বরূপ আলোচনার প্রসঙ্গে আমাদের সনাতন ধর্ম্মের সমষ্টি স্বরূপ এক-মাত্র লক্ষ্য থাকিলেও আমরা আপাততঃ ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ দেখাইতে বাধ্য হইব।

ধর্ম্ম আপাততঃ বাহ্যিক ও আন্তর দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে। দেবোদ্দেশে তুলসী চয়ন, তীর্থপর্য্যটন, গঙ্গাস্নান ইত্যাদি ইত্যাদি বাহ্যেন্দ্রিয় নির্ব্বাহ্য ক্রিয়াকলাপ বাহ্যিক ধর্ম্ম। বৈরাগ্য, ক্ষান্তি, ঔদার্য্য ইত্যাদি অন্তরেন্দ্রিয় মনের অন্তর্মুখীন বৃত্তিগুলি আন্তর ধর্ম্ম। আন্তরধর্ম্ম জ্যেষ্ঠ ও বাহ্যিকধর্ম্ম কনিষ্ঠ। লক্ষ্মণের মত এ ক্ষেত্রে কনিষ্ঠই জ্যেষ্ঠের প্রধান সহায়। আজ-কাল অনেকেই বাহ্যিক ধর্ম্মের প্রতি বিবিধ প্রকার উপহাস করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় তাঁহারা প্রণিধান পূর্ব্বক চিন্তা করেন না যে, তাঁহাদের অভীপ্সিত আন্তর ধর্ম্মটী বাহ্য ধর্ম্মের সহিত দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায় তপ্ত-অয়ঃপিণ্ডে অগ্নির ন্যায় অভেদ সম্বন্ধে সম্বন্ধ। যাঁহাদের অনুভব আছে, অবশ্য তাঁহারা জানেন যে, কাষায় বাস পরিধান করিয়া ত্রিপুণ্ড্র কাটিয়া কমণ্ডলু হস্তে বহির্গত হইলে স্বভাবতই মনে আসে যে—"বম বম হর হর শিব শঙ্কর" বলি ;—কিন্তু তেড়ি কাটিয়া ছড়ি ধরিয়া জামাজোড়া পরিয়া বাহির হইলে, তখন নিধুবাবুর টপ্পা ও গোপাল উড়ের কবির

গানগুলি স্বভাবতই মনে আসিয়া উদিত হয়। তাই বলিতে-ছিলাম, বাহ্যিক ধর্ম্মের সহিত আন্তর ধর্ম্ম ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সম্বন্ধ। ইহা যে কেবল আমরা সিদ্ধান্ত করিতেছি তাহা নহে। পঞ্চদশী-কার বিদ্যারণ্য মুনিও স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন—

"ন হৃত্থাকার মাধাতুং বাহ্যস্যাপেক্ষিতত্ত্বতং"

হৃত্থাকার অর্থাৎ আন্তর পদার্থ প্রস্তুত করিতে বাহ্যের অপেক্ষা অবশ্যম্ভাবী। অতএব ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাহ্যাড়ম্বর দেখিয়া সন্দিহান হওয়া অথবা উপহাস করা বিজ্ঞোচিত কার্য্য নহে। স্নান, আহ্নিক, শৌচ, সদাচারাদি যাহা কিছু নৈষ্ঠিক হিন্দুর বাহ্যানুষ্ঠান সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তরে অন্তর্য্যামীর সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত কোনটীই ধর্ম্মবহির্ভূত নহে, সমস্তই ধর্ম্ম।

সাধারণতঃ আজকাল নব্যশিক্ষিত বাবুদিগকে এই বাহ্যিক ধর্ম্মের প্রতি কটাক্ষ করিতে দেখিলে যুগপৎ ক্ষোভ ও বিস্ময় হয়। বৈষ্ণবের সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্ত হরেকৃষ্ণ নামের ছাপ দেখিয়া বাবুরা বলিয়া থাকেন,—আহা বৈষ্ণব ঠাকুরটী যেন "ডেড্‌লেটার আফিসের ফেরৎ চিঠি।" হাতে নামের ঝোলা দেখিলে বলেন "কুঁড়াজালী" মুণ্ডিত মুণ্ড—তাহাতে শিখাস্পর্শী তিলক ও ছোট্-হীন বহির্ব্বাস দেখিয়া বলিয়া থাকেন, বাবাজী যাচ্ছেন না আস্ছেন ?" ইত্যাদি বিবিধ উপহাস করিয়া থাকেন। কথাগুলি হাস্যোদ্দীপক হইলেও ধার্ম্মিকের দুঃখজনক সন্দেহ নাই। আমরা বলি ব্যবসাদার অর্থাৎ সাজা বৈষ্ণবকে বাদ দিয়া ইহাঁরা যদি

প্রকৃত বৈষ্ণবের প্রতি এরূপ বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। বাবুরা ইহা বিলক্ষণ জানেন যে, ইস্কুলে যাইবার পোষাক পরিচ্ছদ ও বেড়াইতে যাইবার পোষাক পরিচ্ছদ একরূপ নহে। যে সময়ে যে পরিচ্ছদ যে কার্য্যের অনুকূল সে সময়ে সেই পরিচ্ছদ যে সর্ব্বথা গ্রাহ্য ইহা বোধ হয় কি বাবু কি গোঁড়া সকলেই স্বীকার করিবেন।

বাবুগণ বহুমূল্য কাপড়ে আবৃতাঙ্গ হইয়া বিলাসিতার পরিচয় দিতেছেন ; বৈষ্ণব, নগণ্য একখানি কাপড় ছেঁড়ায় কটি আবৃত করিয়া দীনতার পরিচয় দিতেছেন। বাবু সর্ব্বাঙ্গে যুথী-চামেলি-ফুলেলা তৈলে এবং লেভেণ্ডার এসেন্স ইত্যাদি সদ্গন্ধবিশিষ্ট পদার্থে দেহখানি সৌরভময় করিয়া বিলাসিনীর বিলাসলীলার উপযুক্ত করিতেছেন ; বৈষ্ণব, চন্দন উর্যার তুলসীর দ্বারা অভি-ব্যাপ্ত শরীর হইয়া জগদ্ধাত্রী বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার করুণা-কণা পাইবার পথ উন্মুক্ত করিতেছেন। বাবুরা হাতের কব্জায় চামের দড়িতে ঘড়ি বাঁধিয়া সময় দেখিবার সুবিধা করিতেছেন ; বৈষ্ণব, নামের ঝোলা লইয়া রসময়কে ডাকিবার সুবিধা করিতেছেন। মন বিশাল জগতে বিরাট পুরুষের বিরাট আকার নির্ণয় করিতে গিয়া হতভম্ব হইয়া পড়িবে। অতএব মনকে বিশাল জগত হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া হস্তে আনিয়া যেন একটী লক্ষ্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখা হইতেছে। তাহা হইলে দেখুন উপহাস্য বৈষ্ণব ও উপহাসক বাবু উভয়ে স্ব স্ব উদ্দেশ্যের

অনকূলে একটা নয় একটা বাহ্যিক আড়ম্বর গ্রহণ করিয়াছেন কি না? এরূপ অবস্থায় নিজের ঔপাধিক ভাবটী বিস্মৃত হইয়া পরের ঔপাধিক ভাবটী লইয়া হাস্য বিদ্রূপ করিলে একদেশদর্শী বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়া যায় না কি? বাবু ও বৈষ্ণবের উদ্দেশ্য দ্বিতয়ের মধ্যে কোনটী সাধু, সুধীগণ তাহার বিবেচনা করুন।

তাই বলিতেছিলাম বাবুগণের স্বীয় দোষের অনন্বেষণ ও পর দোষের ব্যাখ্যান দেখিলে যুগপৎ ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়। ধর্ম্মকে বাহ্য ও আন্তর দুইভাগে বিভক্ত করিলেও আন্তর ধর্ম্ম যে বাহ্যসাপেক্ষ ইহা এক প্রকার বলা হইল। অতঃপর সামাজিক ধর্ম্মের কথা বলিব।

কতকগুলি সংপৃক্ত ব্যক্তি লইয়া এক একটী পরিবার গঠিত হয়। এবং অসংখ্য পরিবার লইয়া এক একটী সমাজ গঠিত হয়। সমস্ত পরিবারগুলিকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলায় চালিত করতঃ সমাজ-শরীরকে যে অক্ষুণ্ণ রাখে তাহাই সামাজিক ধর্ম্ম।

পারিবারিক ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সামাজিক ধর্ম্ম এক। আপত্তি হইতে পারে সমাজের শরীর স্বরূপ পরিবারগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত হইলে সামাজিক ধর্ম্ম এক হইবে কিরূপে? তাহা হইতে পারে—ধর্ম্মের অধিকাংশে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিলেও এমন একটী অংশ আছে, যাহাতে আমরা সকলে এক মত আছি ও থাকিব তাহাই সামাজিকধর্ম্ম।

এক রজ্জুতে ২০।২৫টী গরু গ্রথিত থাকিলেও তাহাদের নাসারজ্জু পৃথক পৃথক। নাসারজ্জুর পার্থক্য থাকিলেও গ্রথন রজ্জু যেমন ভিন্ন নহে, তদ্রূপ পারিবারিক ধর্ম্মে পার্থক্য থাকিলেও সামাজিক ধর্ম্ম এক। এই সামাজিক ধর্ম্মের আকার ও প্রকার কিরূপ ও এই সামাজিক ধর্ম্ম অব্যাহত থাকিলে সমাজ যে প্রকারে উন্নত হয় এবং ইহার বিপর্য্যয়ে সমাজ কি প্রকার বিপর্য্যস্ত হয়, অতঃপর তাহারই আলোচনা করিব। আজ এই পর্য্যন্ত। হরে ওঁ তৎসৎ।

সমাপ্ত।